মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

নভেম্বর ২০২৫
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২
জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ ॥ ৪
দারসুল হাদীস ॥
আমানতের খিয়ানত না করা : মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৩
চিন্তাধারা
ভারতের চোখে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা :
'তাজউদ্দীন ও ওসমানী দুই ব্লাডি ইঁদুর'
আবুল আসাদ ॥ ২৭
ইসলামের রাজনীতি
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ॥ ৩৬
নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ : ইসলামে তার প্রতিকার
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৪২
আন্তর্জাতিক
মার্কিন নীতি ও মধ্যপ্রাচ্য
মীযানুল করিম ॥ ৫২
প্রশ্নোত্তর ॥ ৬০
বই পরিচিতি :
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ॥ ৬৪

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয় ....

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য পারস্পরিক সুসম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ

কোনো দেশ বা জাতির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি সুরক্ষা ও মর্যাদার জন্য ঐক্য ও সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'একতাই বল' প্রবাদটিও সেদিকেই ইঙ্গিত করে। আল কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একত্রে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই সফলতার দ্বার উন্মোচন করে। এজন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর রাস্তায় লড়ে।" (সূরা আস সাফ: ৩) পক্ষান্তরে পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদ কোনো দল, সমষ্টি বা জাতিকে দুর্বল করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তোমরা ভীরু কাপুরুষে পরিণত হবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চলে যাবে।" (সূরা আনফাল: ৪৬)

ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং তা সুদৃঢ় করার জন্য পারস্পরিক সুসম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুসম্পর্ক ব্যতীত সুদৃঢ় ঐক্য কখনই সম্ভব নয়। এজন্য ইসলাম পারস্পরিক সুসম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।" (সূরা আল হুজুরাত : ১০) ভাই-এর সাথে ভাই-এর সম্পর্ক যেমন গভীর ও মজবুত, একজন মুমিনের সাথে অপর মুমিনের সম্পর্কও তেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পর্ককে মজবুত করা এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য ইসলাম দু'ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রথমতঃ যে সকল বিষয় পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট বা দুর্বল করে, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। হিংসা-বিদ্বেষ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, পরনিন্দা ও চুগলখুরী, অন্যের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ, অন্যের প্রতি অহেতুক কুধারণা, জুলুম ও বে-ইনসাফী করা, ছিদ্রান্বেষণ ও দোষ খুঁজে বেড়ানো প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিষয় সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে সেগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসা, নিজে যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করা, ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করা, একে অপরকে সাহায্য করা, সুখে-দু:খে সংগে থাকা, উপঢৌকন প্রদান, প্রত্যেককে প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান এবং সম্মান ও স্নেহ করা প্রভৃতি। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে মানুষও অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। ফলে পরস্পরের সম্পর্ক খুবই ঠুনকো হয়ে পড়েছে। এজন্য ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুন-খারাবী প্রভৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। মানবিক মূল্যাবোধের স্থান দখল করে নিয়েছে অমানবিকতা। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়েছে। আর সে কারণেই দুর্বল হয়ে পড়েছে সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধ। পাশাপাশি দুর্বল হয়ে পড়ছে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, যা একটি জাতির জন্য অশনি সংকেত।

এজন্য সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতি পরিহার করে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার নিবিড় সম্পর্ক, গড়ে তুলতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক। তাহলেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি মজবুত ও সুসংহত হবে। ■

সূরা আল মুদ্‌দাসসির : আয়াত : ১-৭

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَاَنْذِرْ – وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ – وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ – وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ – وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ – وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

২। ভাবানুবাদ

‘ওহে আবৃত ব্যক্তি, উঠ, (লোকদেরকে) সাবধান কর। এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর। এবং তোমার পোশাক পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখ। এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে দূরে থাক। এবং বেশি পাবে আশায় অনুগ্রহ করো না। এবং তোমার রবের খাতিরে ছবর অবলম্বন কর।’

৩। পরিপ্রেক্ষিত

ইতিহাস বিশ্লেষকরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব কালকে ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সন্দেহ নেই, সেই যুগের জন্য এই আখ্যাটিই যথার্থ।

সেই যুগটি ছিলো মানব সমাজ ও সভ্যতার অতি অধপতিত একটি অধ্যায়।

দেশে দেশে তখন রাজা আর সম্রাটদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তারা মানুষের প্রভু সেজে বসেছিলো। তাদের খেয়াল-খুশিই ছিলো আইন। আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তখন তা ছিলো এক কল্পনাতীত বিষয়।

রাজা বা সম্রাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো একটি অভিজাত শ্রেণী। তাদের আর জনগণের মাঝে ছিলো দুস্তর ব্যবধান। তারা জনসাধারণকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কিন্তু তাদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঐ সাধারণ মানুষগুলো থেকেই আদায় করা হতো।

হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজা বা সম্রাট এবং তাদের অনুগ্রহভাজন অভিজাত গোষ্ঠী ছিলো মদখোর। মদ খেয়ে মাতলামী করা আর নিত্য নতুন নারী দেহ ভোগ করা ছিলো তাদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই বিপুল সংখ্যক নারীকে হতে হয়েছে বেহায়া এবং উলংগ কিংবা অর্ধ-উলংগ।

সেই যুগে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো অসহনীয়। সেটি ছিলো সুদখোরদের স্বর্ণ যুগ। কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি সুদের মাধ্যমে অগণিত মানুষের কাছ থেকে টাকা ছেঁকে নিয়ে গড়তো টাকার পাহাড়। পুঁজিপতিরা হতো 'আংগুল ফুলে কলাগাছ'। ঋণ গ্রহীতারা হতো কংকালসার।

সেই যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই গরু, ছাগল, উট, ভেড়ার মতো মানুষ বেচা-কেনার জন্যও হাট বসতো। এক বিত্তবান ব্যক্তির কাছ থেকে আরেক বিত্তবান ব্যক্তি কিনে নিতো দাস-দাসী। এরা রাতভর-দিনভর শ্রম দিতো মনিবের বাড়িতে, বাগানে, খামারে কিংবা কারখানায়। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ছিলো মৃত্যু।

সেই যুগে নারীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিলো না। নারীদের একমাত্র কর্তব্য ছিলো পুরুষদের যৌন ক্ষুধা মেটাতে থাকা। একজন পুরুষ যতো সংখ্যক ইচ্ছা বিয়ে করতে পারতো। আবার বিত্তবান হলে রক্ষিতা হিসাবে রাখতে পারতো অসংখ্য নারী। কোন কোন অঞ্চলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা তাদের সৎ-মা'দেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। কোন কোন অঞ্চলে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে মেরে অথবা জীবিতাবস্থায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো।

রাজা বা সম্রাটরা ওঁত পেতে থাকতো পররাজ্য আক্রমণের জন্য। পররাজ্য দখল করে সেখানে তারা তাদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিতো, দুই হাতে লুটে নিতো দখলকৃত দেশের সম্পদ, যুবকদেরকে করতো হত্যা, আর যুবতীদেরকে ধরে নিয়ে যেতো তাদের যৌবন রস আস্বাদনের জন্য।

সেই যুগে সামগ্রিকভাবে মানুষের জান, মাল ও ইয্যাতের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি ইত্যাদি ছিলো নিত্য-দিনের ঘটনা।

তদুপরি এটি ছিলো চরম ধর্মীয় বিকৃতির যুগ। মাক্কায় অবস্থিত তাওহীদের কেন্দ্র কা'বায় স্থাপিত হয়েছিলো ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হতো। এদের উদ্দেশ্যে উট, ভেড়া, বকরি বলি দেওয়া হতো।

আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যিয়ারাতকারীরা উলংগ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করতো। আরবের মুশরিকদের ছালাত সম্পর্কে সূরা আল আনফালের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً .

'তাদের ছালাত ছিলো বাইতুল্লাহর কাছে শিস দেওয়া আর হাত তালি দেওয়া।'

আরবের পূর্ব দিকে ছিলো ইরান সাম্রাজ্য। কল্পিত দেবতা আহুর মাজদা ছিলো ইরানীদের সবচে' বড়ো উপাস্য। তাদের ধারণায় আহুর মাজদা-র প্রকাশ ঘটতো আগুনের শিখার মাঝে। তাই পুরোহিত কর্তৃক প্রজ্জলিত আগুনের অনির্বাণ শিখার উদ্দেশ্যে তারা সাজদা করতো।

আরবের উত্তরে ছিলো বিশাল রোমান সামাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যে তখন সেন্ট পল কর্তৃক উদ্ভাবিত খৃস্টবাদের বেশ প্রসার ঘটে। সেন্ট পল ছিলেন ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা। তাঁর

প্রচারিত ধর্মমত মারইয়াম (রা) এবং ঈসা ইবনু মারইয়ামকেও (আলাইহিস সালাম) খৃস্টানদের উপাস্যে পরিণত করে।

কালক্রমে খৃস্টানগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ভাগ বৈরাগ্যবাদকে তাদের জীবনাদর্শ বানিয়ে নেয়। অপর ভাগটি ভোগবাদী হয়ে পড়ে। বৈরাগ্যবাদী খৃস্টানগণ গোসল না করা, ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরা, গোশত-রুটি না খাওয়া ইত্যাদিকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতো। পক্ষান্তরে, ভোগবাদী খৃস্টানগণ ভুরিভোজ, মদপান ও অবাধ যৌনাচারে মত্ত হয়ে পড়ে। তাদের মদের আসরে অর্ধ-উলংগ নর্তকীরা নাচতো ও গান গাইতো। সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালিয়ে গোটা পরিবেশকে উত্তেজক করে তোলা হতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী বলে দাবি করতো। প্রকৃতপক্ষে তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি নাযিলকৃত আত্ তাওরাতের অনুসারী ছিলো না। বরং তারা আত্ তাওরাতকে বিকৃত করে ফেলেছিলো এবং বহু হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিলো। মুজাদ্দিদ উযাইরকে (রাহ) তারা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো।

সামগ্রিকভাবে তখন গোটা পৃথিবী ছিলো জাহিলিয়াতের পদানত।

সেই যুগে দুই চারজন বিবেকবান ব্যক্তি যে ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অসহায়। তদুপরি অধপতিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেংগে নতুন সমাজ বিনির্মাণের কোন নীতিমালা ও কলা-কৌশল তাঁদের জানা ছিলো না।

এই মহা দুর্দিনে পৃথিবীবাসীকে মুক্তির পথ বাতলাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটান। তিনিই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা শহরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্ধিত হন। তিনি যখন ১৭ বছরের তরুণ, তখন তাঁর চাচা আযযুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব কিছু বিবেকবান ব্যক্তিকে নিয়ে একটি মিটিং করেন। আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের ঘরে অনুষ্ঠিত হয় সেই মিটিং। বানু হাশিম, বানু জুহরাহ, বানু তাইম এর বেশ কিছু সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার নাম রাখা হয় হিলফুল ফুদুল। এর পাঁচ দফা কর্মসূচি ছিলো নিম্নরূপ–

- আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।
- আমরা মুসাফিরদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।
- আমরা অভাবীদেরকে সাহায্য করবো।
- আমরা মাযলুমের সাহায্য করবো।
- আমরা কোন যালিম ব্যক্তিকে মাক্কায় আশ্রয় দেবো না।

তরুণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুণ উৎসাহ নিয়ে এই সংস্থার সদস্য হন এবং সমাজে একটি কল্যাণ ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে নিয়োজিত থাকেন।

২৩ বছর ধরে চলে এই প্রয়াস। দেখা গেলো ২৩ বছর আগে সমাজ যেই তিমিরে ছিলো ২৩ বছর পর সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাবুক প্রকৃতির হয়ে ওঠেন। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে শুরু করেন। এই সময়টি সম্পর্কে আয়িশা আছ ছিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহকে সম্মানিত এবং মানব জাতিকে তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত করতে চাইলেন তখন রাসূলুল্লাহ নুবুওয়াতের অংশ হিসেবে স্বপ্ন দেখতে থাকেন যা সূর্যোদয়ের মতো সত্য হতো। এই সময় আল্লাহ তাঁকে নির্জনে অবস্থানের প্রতি আগ্রহী করে দেন। নির্জনতা তাঁর প্রিয় ওঠে।'

এই নির্জনতা প্রীতি ও নিভৃত অবস্থানেরই নাম 'তাহান্নুস'।

নিভৃতে একাকীত্বে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেছে নেন জাবালুন্ নূরের হেরা গুহাটি। তিনি কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন। খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে গুহা থেকে নেমে ঘরে এসে আবার কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে চলে যেতেন।

উল্লেখ্য, জাবালুন্ নূর কা'বা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হেরা গুহা পর্যন্ত উঠতে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মতো সময় লেগে যায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গুহা পর্যন্ত পৌঁছা সহজ কাজ নয়। নিভৃতে আল্লাহর ইবাদাতে কাটাবার জন্য তিনি এই গুহাটিকেই বেছে নেন।

এই অবস্থাতেই একদিন আল্লাহর দূত জিবরীল (আলাইহিস সালাম) হেরা গুহায় এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরীল (আলাইহিস সালাম) 'তাঁকে আবার বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।'

তৃতীয়বার তাঁকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ– اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

'পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড় এবং তোমার রব বড়োই অনুগ্রহশীল। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।'

এবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আলাইহিস সাল্লাম)-এর সাথে আয়াত গুলো উচ্চারণ করলেন এবং এই গুলো তাঁর অন্তরে গেঁথে গেলো।

অতপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে যান। ভীত কম্পিত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা গুহা থেকে নেমে ঘরে ফেরেন এবং স্ত্রী খাদীজা

বিনতু খুয়াইলিদকে (রা) ডেকে বলেন, 'যাম্মিলুনী যাম্মিলুনী।' (আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও)।

ভীতি ভাব কেটে গেলে তিনি বললেন, "খাদীজা, আমার কী হয়ে গেলো। আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে।" খাদীজা (রা) বললেন, "আপনি আশ্বস্ত হোন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, আমানাতের হিফাযাত করেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিজে উপার্জন করে অভাবীদেরকে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করেন।"

সূরা আল 'আলাকের এই পাঁচটি আয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নাযিলকৃত প্রথম ওহী।

ঈসায়ী ৬১০ সনের রমাদান মাসে এই আয়াত গুলো নাযিল হয়। এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহকেন্দ্রিক জ্ঞান চর্চার আহ্বান জানানো হয়েছে। মাতৃগর্ভে সন্তানের উন্মেষ হওয়ার প্রথম কয়েকটি দিন জরায়ু গাত্রে ঝুলে থাকা অতি ছোট্ট একটি রক্ত পিণ্ড থেকে যে মানুষের যাত্রা শুরু, সেই জ্ঞান তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি নগণ্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষ যে অসামান্য অবস্থায় উন্নীত হয়, সেই সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়েছে।

এই আয়াত কয়টিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নবী বানানো হয়েছে সেই ধারণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর করণীয় কী তা এই আয়াতগুলোতে বলা হয়নি।

প্রথম ওহী নাযিলের পর কেটে যায় কয়েকটি মাস। এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন মাক্কার একটি পথ ধরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি জিবরীলকে (আলাইহিস সালাম) দেখতে পান এবং দ্রুত কদমে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বলেন, "যাম্মিলুনী যাম্মিলুনী।"

গায়ে কম্বল জড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সংগ ছাড়লেন না। তিনি সূরা আল মুদ্দাসসিরের এই সাতটি আয়াত আবৃত্তি করলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াত গুলো পড়লেন এবং এই গুলো তাঁর অন্তরে গেঁথে গেলো।

৪। ব্যাখ্যা

□ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

এটি এই সূরার প্রথম আয়াত। এই আয়াতের 'মুদ্দাসসির' শব্দটি নিয়ে এই সূরার নাম করণ করা হয়েছে।

এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ওহে আবৃত ব্যক্তি' অথবা 'ওহে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি।'

এটি একটি প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'ইয়া মুহাম্মাদু' কিংবা 'ইয়া আইউহান্নাবীউ' বলেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করতে পারতেন। তা না করে তিনি এই প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন ব্যবহার করাটাই পছন্দ করেছেন।

☐ قُمْ فَاَنْذِرْ.

এটি এই সূরার দ্বিতীয় আয়াত। এর অর্থ 'ওঠ, (লোকদেরকে) সাবধান কর।'

এই আয়াতের মাধ্যমে নবী হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যতম কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

قُمْ শব্দের অর্থ 'ওঠ'। আবার এর অর্থ হয় 'দাঁড়াও', 'কর্তব্য কর্মে নেমে পড়'।

فَاَنْذِرْ অর্থ 'লোকদেরকে সাবধান কর।'

অর্থাৎ লোকেরা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে একদিকে দুনিয়ার জীবনে অশান্তি ভোগ করছে, অপর দিকে আখিরাতের অনন্ত জীবনে চিরন্তন শাস্তি ভোগ করা সুনিশ্চিত করছে। অতএব এই বিষয়ে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর। তাদেরকে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করতে বল।

☐ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .

অর্থ 'এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর।'

এটি এই সূরার তৃতীয় আয়াত। এই আয়াতটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। ছোট্ট দুইটি শব্দের মাধ্যমে নবী হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রধান কর্তব্য কী তা তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই সুমহান কর্তব্যটি হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা ও প্রতিষ্ঠা করা।

মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ। মহাবিশ্ব আল্লাহর বিধান মেনে চলে আল্লাহরই বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করছে। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। মানুষের কর্তব্য আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলে আল্লাহর বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা।

কিন্তু মানুষ নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপর কোন মানুষ কিংবা অপর কোন সৃষ্টিকে বড়ো কিংবা শ্রেষ্ঠ মনে করে তার বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এটি মানুষের জন্য সমীচীনও নয়, শোভনীয়ও নয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবকালে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবগোষ্ঠী এই অসমীচীন ও অশোভনীয় কাজটিই করছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নির্দেশ দিলেন, 'ওয়া রাব্বাকা ফা-কাব্বির' (তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর)। উল্লেখ্য যে বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটির সমভাব প্রকাশক আরেকটি শব্দ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই ছোট্ট আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায় করে তাঁরই প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপনের জন্য মানবগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাবার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেওয়া হয়।

☐ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

অর্থ 'এবং তোমার পোশাক পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ।'

এটি এই সূরার চতুর্থ আয়াত।

طُهْرٌ শব্দটি 'তুহরুন' বা 'তাহারাত' শব্দ থেকে উৎসারিত। 'তুহরুন' বা 'তাহারাত' শব্দটি যুগপৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্থ প্রকাশ করে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বভাবগত ভাবেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তিনি যেন সচেতনভাবে এবং কর্তব্য মনে করে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন তারই শিক্ষা রয়েছে এই আয়াতে।

নৈতিক দিক দিয়ে পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ হচ্ছে, পোশাক এমন হতে হবে যাতে অহংকার প্রকাশ পাবে না, তাতে কুরুচির ছাপও থাকবে না। উল্লেখ্য যে এই আয়াতের শিক্ষা পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিনদের বিছানার চাদর, বালিসের কাভার, দরওয়াজা-জানালার পর্দা, আসবাব পত্র, গৃহের অভ্যন্তর এবং বহিরাংগন পরিচ্ছন্ন রাখাও এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ اللهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ....فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ.

[ছালিহ্ ইবনু আবি হাসসান (রহ), জামে আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-২৭৩৬]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন।... অতএব তোমরা তোমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখ।"

☐ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

অর্থ 'এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে দূরে থাক।'

এটি এই সূরার পঞ্চম আয়াত। এটিও একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত।

চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডে জাহিলিয়াতের মলিনতার সামান্যতম ছোঁয়াও যেন লাগতে না পারে সেই জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

☐ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.

অর্থ 'এবং বেশি পাবে আশায় অনুগ্রহ করো না।'

এটি এই সূরার ষষ্ঠ আয়াত। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়াসে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য এটি আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় একটি নীতি।

মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া, মানুষকে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপনের দিকে টেনে আনা, মানুষের প্রতি অতি বড়ো অনুগ্রহ।

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এই বিরাট অনুগ্রহের কাজটি করতে হবে শুধু আল্লাহর জন্য, অন্য কারো কাছ থেকে কোন রূপ বিনিময় পাওয়ার জন্য নয়। পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থতাসহকারে এই কাজ করতে হবে, কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থ-সুবিধা লাভের আশা মনে পোষণ করা যাবে না।

এই শিক্ষা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্য সব নবী-রাসূলকেও দিয়েছিলেন। তাই তো আমরা তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি,

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

'আমি তো তোমাদের কাছে এই কাজের কোন বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো রয়েছে রাব্বুল 'আলামীনের নিকট।'

নূহ (আলাইহিস সালাম) কুর্দিস্তান-এর অধিবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১০৯),
হূদ (আলাইহিস সালাম) 'আদ জাতিকে (আশ্ শূ'আরা, ১২৭),
ছালিহ (আলাইহিস সালাম) ছামুদ জাতিকে (আশ্ শূ'আরা, ১৪৫),
লূত (আলাইহিস সালাম) ট্রান্সজর্ডনের অধিবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১৪৬),
এবং শু'আইব (আলাইহিস সালাম) মাদ্ইয়ানবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১৮০),
সম্বোধন করে এ কথাই বলেছিলেন।

□ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

এটি এই সূরার সপ্তম আয়াত। এটিও একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবেমাত্র নুবুওয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হলো। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়ার ডাক তিনি এখনো দেননি। ফলে ময়দানে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনো দেখা যায়নি। তথাপিও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য-পালন করতে গেলে তাঁকে বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। চলার পথের বাঁকে বাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। বাধা যতোই কঠিন হোক না কেন, পরিস্থিতি যতোই ভীতিপ্রদ হোক না কেন তাঁকে কর্তব্য কর্মে দৃঢ়পদ থাকতে হবে।

৫। শিক্ষা

- □ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব তথা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদেরকে নিবেদিত হতে হবে।
- □ আমাদের পোশাক হতে হবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল এবং গর্ব অহংকারের ছাপমুক্ত। আমাদের গৃহাংগন ও গৃহের পার্শ্বস্থ অংগনও হতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
- □ আমাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড হতে হবে জাহিলিয়াতের মলিনতার ছোঁয়া মুক্ত।
- □ আমাদেরকে আল্লাহর বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে, কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থ সুবিধা লাভের আশা থেকে মনকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রেখে।
- □ আমাদেরকে বিরোধিতা, বাধা-বিপত্তি এবং কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ছবর অবলম্বন করতে হবে।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ

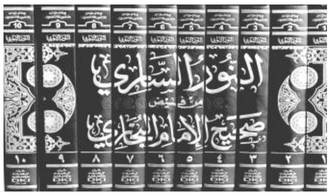

আমানতের খিয়ানত না করা : মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ « أَيْنَ – أُرَاهُ – السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ » . قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

অনুবাদ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা নবী (স) এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুইন তাঁর নিকট এসে বললো, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? (রাবী বলেন,) রাসূলুল্লাহ (স) কথা বলে যাচ্ছিলেন। তখন কেউ বললো, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু সে যা বলেছে তিনি তা অপছন্দ করেছেন। তাদের কেউ বললো, না, বরং তিনি তার কথা শোনতে পাননি। অবশেষে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করে বলেছেন, লোকটি কোথায়? (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি বলেছেন : কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো, এই যে আমি, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকবে। লোকটি বললো, আমানত কীভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি বলেন, যখন কোনো কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকবে"।[১]

ব্যাখ্যা

আলোচ্য দারসুল হাদীসে কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন- কিয়ামতের দীন-ক্ষণ সম্পর্কিত প্রশ্ন; আমানত নষ্ট হওয়ার বিষয় এবং আমানত নষ্ট হওয়ার কারণ। প্রথমে আমরা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয় সম্পর্কে জানবো। আমরা জানি, ইসলামী আকীদায় যেসব মৌলিক বিষয় রয়েছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিশ্বাসটি সেবের

১. বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব: মান সুয়িলা 'ইলমান ওয়া হুয়া মুশতাগিলুন ফী হাদীসিহি..., নং ৫৯

অন্যতম। কুরআন-হাদীসে কিয়ামতের সত্যতা ও ভয়াবহতার বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

কিয়ামত সত্য

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .

"কিয়ামত অবশ্যাম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না"।[২]

কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ কেবল আল্লাহ্ জ্ঞাত

ইসলামে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলোর সঠিক জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহর রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ .

"নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান"।[৩]

কিয়ামতের ভয়াবহতা

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা অবশ্যাম্ভাবী। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। সেদিনের মুক্তি হবে কেবল আমল ও মহান আল্লাহর রহমতের কারণেই। মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ .

"সেদিন (কিয়ামত) মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছে থেকে এবং তার মাতা ও পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে"।[৪]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

"সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিলো তাদের কাছ থেকেও নয়"।[৫]

কিয়ামতের দিন-ক্ষণ, লক্ষণ ও ভয়াবহতার বিষয়ে হাদীসেও ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– : « مَا يُبْكِيكِ ». قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– : « أَمَّا فِى ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِى يَمِينِهِ

২. ৪০-সূরা আল-মুমিন : ৫৯
৩. ৩১-সূরা লুকমান : ৩৪
৪. ৮০-সূরা আবাসা : ৩৪-৩৭
৫. ৫৭-সূরা আল-হাদীদ : ১৫

أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ».

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ওঠেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবার-পরিজনের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন তিনটি স্থান আছে যেখানে কেউ কাউকে মনে রাখবে না। (স্থানগুলো হলো), (ক) মীযানের কাছে,যতক্ষণ না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে না বেশি হবে; (খ) আমলনামা প্রাপ্তির স্থান, যখন বলা হবে 'আমার আমলনামা নাও, পড়ে দেখো' (৬৯-সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯)। কেননা তখন সকলে ভীষণ পেরেশানির মাঝে থাকবে যে, তার আমলনামা কি সে ডান হাতে পাবে, না পেছন থেকে বাম হাতে পাবে এবং (গ) পুলসিরাতের কাছে,যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে"।[৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ « تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً » قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالَ « الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " মানুষকে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পায়ে, বিবস্ত্র ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ ও নারীগণ তো একে অপরের প্রতি তাকাবে। তিনি বলেন, এর চেয়েও সেদিন কঠিনতর অবস্থা হবে"।[৭]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা গেলো। কিন্তু কিয়ামতের দিন-ক্ষণ জানার চেয়ে প্রয়োজন, সেদিনের বিপদ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আমল এবং মহান আল্লাহর রহমত। তাই কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে-এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মহানবী (স) তা অপছন্দ করেন এবং অনেকক্ষণ পর বলেন, আমানতের খিয়ানত করা হলে কিয়ামত সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় প্রথমেই আমরা 'আমানত' সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

আল-আমানাত (**الامانة**) শব্দটি আরবী। এটি ক্রিয়ামূল। এর মূলধাতু: আলিফ-মীম-নূন (আ-মা-না)। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে আল-খিয়ানাহ। আল-আমানাত এর শাব্দিক অর্থ- অন্তরের প্রশান্তি। কোনো মানুষ যখন কারো অনিষ্টকারতিা থেকে নিরাপদ থাকে তখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ .

---

৬. আবূ দাঊদ, কিতাবুস-সুন্নাহ, বাব: ফী যিকরিল মীযান, নং ৪৭৫৭

৭. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব : কাইফাল হাশর, নং ৬৫২৭

"এবং সেসময়কে স্মরণ করো, যখন কা'বা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো"... ।[৮]

আর-রাগিব বলেন, আল-আমানাতু (الامانة)-এর অর্থ- অন্তরের প্রশান্তি লাভ এবং ভয়-ভীতি দূর করা। এই শব্দটির মূল রূপ-আল-আমনু (الامن), আল-আমানু (الامان) ও আল-আমানাতু (الامانة)। শব্দটি মূলত ক্রিয়ামূল এবং এই শব্দগুলো আমানত সুরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ–

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাসভঙ্গ করবে না" (সূরা আল-আনফাল: ২৭)।[৯]

ড. ইবরাহীম মাদকূর বলেন, আল-আমানু (الامان) ও আল-আমানাতু (الامانة) শব্দ দুটো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-আমানাতু (الامانة) শব্দটি আল-খিয়ানাহ (الخيانة) শব্দের বিপরীত।[১০]

আল-আমানাতু (الامانة) শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Reliability, loyalty, fathfulness, integrity, honesty, confidence, trust, good faith ইত্যাদি।[১১]

পারিভাষিক অর্থে আমানত বলতে প্রত্যেক আমানতকৃত বস্তুর সুরক্ষা বোঝায়। যেমন সম্পদের সুরক্ষা, হারাম বর্জন ও গোপনীয়তা রক্ষা। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে পরিশুদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।[১২]

আমানত সুরক্ষার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মানুষের ওপর যেসব কাজ অপরিহার্য করেছেন 'আমানত সুরক্ষা' সেসবের অন্যতম। কুরআন-হাদীসে আমানত সুরক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

আমানত রক্ষা আল্লাহর নির্দেশ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا .

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারের কাছে প্রত্যর্পণ

---

৮. ২-সূরা আল-বাকারা: ১২৫

৯. আল-রাগিব আল-আসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা,২০০৫, পৃ. ৩৩-৩৪

১০. ড. ইবরাহীম মাদকূর, মু'জামুল ওয়াসীত, আল-কাহেরা : তা.বি. পৃ. ৪৮

১১. Hans Wear, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English, Macdonald @ Evans Ltd. London, p. 29

১২. আল-কাফাবী, আল-কুল্লিয়াত, তা.বি. পৃ. ১৮৬-১৮৭

করতে। তোমরা যখন কোনো মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।[১৩]

আমানত রক্ষা করা মুমিনের বিশেষ গুণ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ – أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ –الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

"এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে তারাই হবে অধিকারী, তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে"।[১৪]

আমানতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ.

"তোমরা যদি একে অপরের নিকট (কিছু) আমানত রাখো তবে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে সে যেনো তার আমানত ফেরত দেয় এবং তার প্রতিপালককে ভয় করে"।[১৫]

আমানতের খিয়ানত করা নিষিদ্ধ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাসভঙ্গ করবে না"।[১৬]

আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – قَالَ « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » .

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যার মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে এগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মাঝে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যাবে। সেগুলো হলো : (ক) যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে; (খ) যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে; (গ) যখন চুক্তি করে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং (ঘ) যখন ঝগড়া-বিবাদ করে অশ্লীল কথা বলে"।[১৭]

---

১৩. ৪-সূরা আন-নিসা: ৫৮
১৪. ২৩-সূরা আল-মুমি,নূন : ৮-১১
১৫. ২-সূরা আল-বাকারা: ২৮৩
১৬. ৮- সূরা আল-আনফাল: ২৭
১৭. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব : 'আলামাতুল মুনাফিক, নং ৩৩

আমানতের সুরক্ষা বিপদ থেকে বাঁচার উপায়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِى طُعْمَةٍ ».

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "যদি তোমার মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে দুনিয়া ধ্বংস হলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। (সেগুলো হলো): (ক) আমানতের সুরক্ষা; (খ) সত্য কথা বলা; (গ) উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ করা এবং (ঘ) হালাল রিযিক আহার করা"।[১৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " যে ব্যক্তি তোমার নিকট কিছু আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না"।[১৯]

আমানতের খিয়ানতকারীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ.

সালমান ইবন মূসা (রা) থেকে তার নিজ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমানতের খিয়ানতকারী নারী-পুরুষ, যেনাকার নারী-পুরুষ এবং কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয নয়" (অগ্রহণযোগ্য)।[২০]

আমানত সুরক্ষার প্রতিদান জান্নাত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِىَّ –ﷺ– قَالَ « اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ .

আবূ উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ের যামিন হলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হবো। (বিষয়গুলো হলো): (ক) যখন কথা বলবে, সত্য কথা বলবে; (খ) যখন ওয়াদা করবে, তা পূরণ করবে; (গ) তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে

---

১৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ৬৮১২

১৯. দাউদ, কিতাবুল ইজারা, বাবঃ ফির-রাজুলি ইয়া'খুযু হাক্কাহু মিন তাহতি ইয়াদাহু, নং ৩০৩৭; আদ-দারিমী, কিতাবুল বুয়ূ, বাবঃ ফী আদ্দিল আমানাতি ওয়া ইজতিনাবিল খিয়ানাহ, নং ২৫৯৭

২০. দাউদ, কিতাবুল কাযা, বাবঃ মান তারুদ্দা শাহাদাতুহ, নং -৩৬০২

তা রক্ষা করবে; (ঘ) তোমাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে; (ঙ) তোমাদের চোখ অবনমিত রাখবে এবং (চ) তোমরা তোমাদের হাত সর্ববিধ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে"।[২১]

আমানত উঠে যাওয়ার কারণে মূল্যবোধে ব্যাপক ধস সৃষ্টি হয়

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « سَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "অচিরেই লোকদের ওপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা হবে; আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারীকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুয়াইবিদা হবে বক্তা। জিজ্ঞেস করা হলো, রুয়াইবিদা কী? তিনি বলেন, নীচ প্রকৃতির (অযোগ্য) লোক জনগণের হর্তাকর্তা হবে"।[২২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ –ﷺ– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الإِسْلاَمِ.

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "মহান আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে চান, তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন। যখন তিনি তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন, তিনি তার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তার ওপর আল্লাহর অসন্তোষ থাকায় তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হয়। আর যখন তার কাছ থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তুমি তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই পাবে। তুমি যখন তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসবে পাবে, সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তুমি তাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত অবস্থায় পেলে তাকে অভিশপ্ত হিসেবে দেখতে পাবে। তুমি তাকে অভিশপ্ত রূপে দেখতে পেলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে করবে"।[২৩]

---

২১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং-২৩৪২৮

২২. ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব: শিদ্দাতুয-যামান, নং ৪১৭২

২৩. ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব: যিহাবুল আমানাহ, নং ৪১৯০

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ، قَالَ: يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، وَيُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا فَيَهْوِي فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا، فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَهُوَ يَهْوِي فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ، وَأَشْيَاءُ عَدَّدَهَا، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ " فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قَالَ: كَذَا " قَالَ، كَذَا قَالَ، صَدَقَ أَمَا سَمِعْتَ يَقُولُ اللهُ: { إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء: ٥٨]"

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির সকল গুনাহ মুছে দেয়া হবে, কেবল আমানত ব্যতীত। রাবী বলেন, (কিয়ামতের দিন আমানতদার) ব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত করা হবে, যদিও সে আল্লাহর পথে নিহত হয়ে থাক না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আমানত আদায় করো। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তা কীভাবে আদায় করবো, তা তো দুনিয়ায় রয়ে গেছে। বলা হবে, এ ব্যক্তিকে হাবিয়ার দিকে নিয়ে যাও। তখন তাকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার সামনে তার কাছে থাকা আমানতের সম্পদ পূর্ববৎ উপস্থাপন করা হবে, যেমন তার কাছে আমানত রাখার দিন ছিলো। লোকটি তার আমানতের আকৃতি দেখে চিনতে পারবে এবং সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আয়ত্ত করে নিবে। এরপর সে তা তার দু‘কাঁধে নিবে। এরপর যখন সে ধারণা করবে যে, তার দু‘কাধ থেকে আমানতের ভার পড়ে গেছে, তখন সে তার পিছু অনুসরণ করে (হাবিয়ায়) গড়াতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন, সালাত আমানত, উযূ আমানত, বাটখারা আমানত এবং পরিমাপ যন্ত্র আমানত। এভাবে তিনি আরো কিছু বস্তুর নাম ধরে গুণে গুণে দেখান। তবে সেসবের মধ্যে ভয়াবহ আমানত হচ্ছে গচ্ছিত সম্পদ। রাবী যাযান বলেন, আমি আল-বারাআ ইবন আযিব (রা) এর নিকট গিয়ে বললাম, ইবন মাসঊদ (রা) যা বলেছেন সেবিষয়ে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন, তিনি এরূপ বলেছেন! তিনি তো যথার্থই বলেছেন। তুমি কি শোনোনি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দিতে’ (৪-সূরা আন-নিসা : ৫৮)”।[২৪]

মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের আমানতদারিতা

মহানবী (স) মানবজাতির জন্য উসওয়ায়ে হাসানা-মহত্তম আদর্শ। তাঁর আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বেই

২৪. আল-বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান, নং ৪৮৮৫

হাজরে আসওয়াদ স্থানান্তরের ঘটনায় তদানীন্তন সমাজে 'আল-আমীন'-পরম বিশ্বস্ত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[২৫]

মহানবী (স) খাদীজা (রা)–এর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি ব্যবসায়িক কাজে সামগ্রিকভাবে পরম নিষ্ঠা ও আমানতদারিতার পরিচয় দেন। তাঁর আমানতদারিতা খাদীজা (রা)-কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে এবং তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে।[২৬]

মহানবী (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন, সেসময় তাঁর নিকট কাফিরদের অনেক অর্থ-কড়ি আমানত ছিলো। হিজরতের প্রাক্কালে তিনি তা আলী (রা)-এর নিকট রেখে যান, যাতে তিনি তা পাওনাদারদের যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এটি তাঁর আমানতদারিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়াও তাঁর জীবনে আমানতদারিতার প্রচুর ঘটনা রয়েছে।[২৭]

বিশেষত মহানবী (স) তাঁর ওপর অর্পিত সর্বোচ্চ আমানত যথাযথভাবে আদায় করেন। আর তাহলো, রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালন। তিনি আমানতের খিয়ানতকে ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন। তিনি খিয়ানত থেকে মহান আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন (আবূ দাউদ, নং **১৯১**)।

সাহাবীদের জীবনে আমানতচর্চা

সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন মহানবী (স)-এর আখলাকের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মহানবী (স)-এর ন্যায় তাঁরাও আমানতদারিতার ক্ষেত্রে উচ্চাসনে আসীন ছিলেন। বিশেষত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) আমানতদারিতার জন্য এতোটাই খ্যাতি লাভ করেন যে, তাকে 'আমীনুল উম্মাহ' (উম্মাতের আমানতদার) বলা হতো।

আমানতের বহু মাত্রিক দিক

আমানতের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন-

(১) আল্লাহর সাথে বান্দার সংশ্লিষ্ট আমানত

মহান আল্লাহ যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা করা এবং যেসব কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে আমানত। যেমন, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে তিনি সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا-

---

২৫. ইবন ইসহাক, সীরাতে ইবন হিশাম, ১/১২৭

২৬. ইবনুল আসীর, তারীখে কামিল, ২/২৪

২৭. ইবনুল আসীর, তারীখে কামিল, ২/৭২; ইবন ইসহাক, সীরাতে ইবন হিশাম, ১/১২৭

"আমি আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিলো এবং তাতে তারা শংকিত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। সে অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ"।[২৮]

এই আমানত বলতে দীনের আমানত উদ্দেশ্য। এরপর যেসব আমানত থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

(২) ব্যক্তি জীবনে আমানতদারিতা

মানুষের ব্যক্তি জীবনে আমানত সুরক্ষার বিষয়টি অত্যাবশ্যক। এর কারণ, ব্যক্তি জীবনে আমানতদারিতা থাকার ওপর ঈমান থাকা ও না থাকা নির্ভর করে। যেমন হাদীসে আছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ– إِلاَّ قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর নবী (স) যখনই আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তখন বলতেন, তার ঈমান নেই, যার আমানতদারি নেই এবং তার দীনদারি বলতে কিছু নেই যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না"।[২৯]

কোনো ব্যক্তি পরামর্শ চাইলে তাকে সুপরামর্শদানও আমানতদারিতার লক্ষণ। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে একজন আমানতদার"।[৩০] অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثاً لاَ يَشْتَهِى أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ .

আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " যে ব্যক্তি কারো নিকট এমন কোনো কথা শোনে এবং সে চায় না যে, তা ফাঁস হোক, এ ধরনের কথা হচ্ছে আমানত। তবে বর্ণনাকারী তা গোপন (আমানত) রাখার নির্দেশ না দিলে ভিন্ন কথা"।[৩১]

মোটকথা, কোনো ব্যক্তি কারো কাছে টাকা-কড়ি আমানত রাখলে তা যথাসময়ে ফেরতদান এবং কোনো কথা আমানত রাখলে তা কারো কাছে ফাঁস না করাও আমানত। এর ব্যত্যয় ঘটানো মুনাফিকীর লক্ষণ।

---

২৮. ৩৩-সূরা আল-আহযাব: ৭২

২৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, তা.বি. নং ১২৭১৮; আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, খ.৩, নং ৮৪৩৯

৩০. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব: ফিল-মাশওয়ারাহ, নং-৫১৩০

৩১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ২৮২৭৪

(৩) পারিবারিক জীবনে আমানতদারিতা

মানুষের ব্যক্তি জীবনের পর পারিবারিক জীবনে আমানতদারিতার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত বিষয়সমূহও এই আমানতদারিতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীসে আছে-

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"...তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেনো তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা তা করে, তবে তাদের মৃদু প্রহার করবে। আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সংগত ভভরণ- পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের অধিকার রয়েছে"... ।[৩২]

অপর এক হাদীসে আরো উল্লেখ আছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ».

আবদুর রহমান ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)– কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা আমানতের বড়ো খিয়ানতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়" ।[৩৩]

উপরাক্ত আলোচনা থেকে পারিবারিক জীবনে আমানতদারিতার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

(৪) সমাজ জীবনে আমানতদারিতা

মানবজীবনের তৃতীয় টায়ার হচ্ছে সমাজিক জীবন। সামাজিক জীবনে আমানতদারিতার সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ জীবনে আমানতদারিতা বলতে মানুষের জান-মাল, সম্মান-ইজ্জত অক্ষুণ্ন রাখা, ওয়াদা রক্ষা করা ও মানুষের জন্য নিরাপত্তা ঢাল তৈরি করা বোঝায়। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে,

عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِىَّ – ﷺ – قَالَ « وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ » . قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ » .

---

৩২. মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাব: হিজ্জাতুন-নাবী স. নং ৩০০৯

৩৩. মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, বাব: তাহ্‌রীমু ইফশায়ি সিররিল-মারআতি, নং ৩৬১৬

আবূ শুরাইহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেছেন, " আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন, যার অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"।[৩৪]

কাজেই সমাজ জীবনে আমানতদারিতা বলতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, কারো প্রতি যুলুম না করা, প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল না করা ইত্যাদি বোঝায়।

(৫) রাষ্ট্রীয় জীবনে আমানতদারিতা

রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়া বিশাল আমানত। এতে যেমন বিপুল প্রতিদান লাভের বিষয় আছে, তদ্রূপ আছে আখিরাতে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি। এই আমানত প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারের কাছে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন কোনো মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।[৩৫]

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – فَقَالَ « مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা)-এর খোঁজ-খবর নিতে আসলাম। এসময় উবায়দুল্লাহ (রা) প্রবেশ করেন। তখন তাকে মা'কিল (রা) বলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাবো, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি: যখন কোনো ব্যক্তিকে মুসলিমদের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়, অতঃপর সে খিয়ানতকারী রূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন"।[৩৬]

নির্বাচনে ভোটদান একটি আমানত। কাজেই অপেক্ষাকৃত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে, কোনোভাবে ভোটদান থেকে বিরত থাকা যাবে না। সুতরাং ভোটদানের সময় প্রার্থীর সততা, দীনদারি ও জনসাধারণের প্রতি কমিটমেন্ট সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। কোনোভাবে যেনো চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে,

---

৩৪. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবঃ ইছমু মান লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়ায়িকুহু, নং ৬০১৬

৩৫. ৪-সূরা আন-নিসা: ৫৮

৩৬. বুখারী, কিতাবুল আহ্কাম, বাবঃ মানিস তুরি'আ রায়ি'আতান ফালাম ইয়াসাহ, নং ৭১৫১

আমাদের ভোটে কোনো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হলে আমরা তার ভালো কাজের প্রতিদানের অংশীদার হবো আবার অপাত্রে ভোট দিলে নির্বাচিত প্রতিনিধির পাপাচারের একটি দায়ও আমাদেও ওপর বর্তাবে। এবিষয়ে কুরআনের দলীল উপস্থাপন করা যায়। যেমন-

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا.

"কেউ ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখেন"।[৩৭]

অর্থনৈতিক জীবনে আমানতদারিতা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমানতদারিতা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে তদ্রূপ হতে পারে জাতীয় পর্যায়েও। যেমন ব্যাংকে জমাকৃত আমানতী টাকা হাতিয়ে নেয়া। এধরনের কাজও নিঃসন্দেহে আমানতের খিয়ানত। যেমন-

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ ضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ – ﷺ – « الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِى يُؤَدِّى مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » .

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, " বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ, যাকে কোনো কিছুর নির্দেশ দেয়া হলে সন্তুষ্টচিত্তে তা বাস্তবায়ন করে, সে দাতাদের একজন"।[৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানবজীবনে আমানতদারিতার গুরুত্ব অপরিসীম এবং আমানতের খিয়ানত করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে বিশ্বমানবতার জন্য সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর।

হাদীসের শিক্ষা

(১) আমানত, ঈমান ও ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্যের নাম।

(২) যার আমানতদারিতা আছে তার মাঝে আখলাকের সবটুকু আছে।

(৩) আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

(৪) আমানতের মাধ্যমে দীন, সম্পদ, সম্মান এককথায় যা কিছু নান্দনিক তার সবটুকু সুরক্ষা পায়।

(৫) আখিরাতে ভয়ানক শাস্তির দুঃসংবাদ রয়েছে।

(৬) আমানতদার ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও মানুষের প্রিয়ভাজন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

৩৭. ৪-সূরা আন-নিসা: ৮৫

৩৮. বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাব : ইসতিজারুর রাজুলিস সালিহ, নং ২২৬০

ভারতের চোখে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাঃ 'তাজউদ্দীন ও ওসমানী দুই ব্লাডি ইঁদুর'

আবুল আসাদ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলেছে ৮ মাস ২১ দিন। এর মধ্যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একাই সম্মুখ যুদ্ধের লড়াইয়ে ছিল ৮ মাস ৮ দিন।

আর ভারত যৌথবাহিনীর ব্যানারে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে লড়াই করেছে মাত্র ১৩ দিন, যা তারা শুরু করে ৩ ডিসেম্বর '৭১' তারিখে। মাত্র ১৩ দিন যুদ্ধ করে ভারত গোটা মুক্তিযুদ্ধের নাম দিয়েছে 'পাক-ভারত যুদ্ধ' এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এমনকি 'সহযোগী'র মর্যাদাও না দিয়ে 'ফায়ফরমায়েশ খাটা' লোক হিসেবে দেখিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর কোন কমাণ্ডারকে ঢাকা আসতে না দিয়ে পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণের শর্ত শরায়েত জেনারেল ওসমানী ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে না জানিয়ে এবং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের সময়ের কথা জেনারেল ওসমানী ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে গোপন করে এবং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তাদের না ডেকে বাংলাদেশকে অপমান করা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ ও তার কৃতিত্ব বাংলাদেশের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। একটা অজুহাত হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী বিভিন্ন সমরাঙ্গনে সফরের উদ্দেশ্যে ১১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় অনুপস্থিত থাকায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে পারেননি।[1] এ কথা সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। জেনারেল ওসমানীর বক্তব্যই এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি বলেন, "ঐদিন ও এর আগেরদিন আমি ময়নামতি রণাঙ্গনে, ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে লে. জেনারেল জগজিত সিংহের সাথে মধ্যাহ্নভোজন করি। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে তদানিন্তন লে. কর্নেল শফিউল্লার 'এস ফোর্স' রণাঙ্গন পরিদর্শন করার জন্য আমার যাওয়ার কথা ছিল। জেনারেল জগজিত সিংহ সেদিন না যেতে অনুরোধ করে বলেন, 'সে দিন এস ফোর্স পরিদর্শনে অসুবিধা হতে পারে, যেহেতু তারা অগ্রসর হচ্ছেন। তখন আমার সফরসূচি পরিবর্তন করে সিলেটে 'জেড' ফোর্স পরিদর্শনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানতেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া মিত্র বাহিনীর উচ্চতম কর্মকর্তারাও জানতেন আমি কোথায়।[2]

অতএব রণাঙ্গনে সফরে থাকায় জেনারেল ওসমানী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি, এটা একদমই গাঁজাখুরি কথা। দেখা গেল, ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে জেনারেল

1. মূলধারা, ৭১, মাইদুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৩৬
2. সাপ্তাহিক বিক্রম, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮

ওসমানী এবং জেনারেল জগজিত সিংহ অরোরা একসাথেই ছিলেন। বিকেল চারটায় জেনারেল অরোরা আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা এলেন, জেনারেল ওসমানীকে আনা হলো না কেন? কেন জেনারেল অরোরা আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কথা জেনারেল ওসমানীর কাছে গোপন করেছিলেন? নিশ্চয়ই এজন্যই যে, জেনারেল ওসমানী যাতে ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে না যেতে পারেন।

এভাবে শুধু জেনারেল ওসমানীকে নয়, ঢাকা অভিমুখে অগ্রসরমান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডারের সাথে এই আচরণ করা হয়। জনাব এম. আর আখতার মুকুল লিখেছেন, "আমাদের যেসব ব্রিগেড কমাণ্ডার যুদ্ধ করে ঢাকার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় আসতে না দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।........সাবরুম সেক্টর থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসরমান তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে তার 'জেড ফোর্স' নিয়ে সিলেটের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। 'কে ফোর্স' এর অধিনায়ক খালেদ মোশাররফ কসবা-আখাউড়া থেকে ঢাকার পথে দাউদকান্দি পর্যন্ত এসে হাজির হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃপক্ষ তাকে পথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। অথচ খালেদ মোশাররফ এর দুই নাম্বার সেক্টরের ক্র্যাক প্লাটুন এর প্রধান ক্যাপ্টেন হায়দার তার বল নিয়ে ঢাকার আশেপাশে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।[3]

'এস ফোর্স' এর অধিনায়ক শফিউল্লাহ এক সাক্ষাৎকারে তাঁর নাজেহালের এক বেদনাদায়ক কাহিনী বলেছেন, "ভারতীয় কমাণ্ডার তাঁর ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া পছন্দ করেননি। আখাউড়া দখলের পর ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক তাকে আখাউড়া প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা বললেন এবং তার বাহিনী ভৈরবের দিকে যাবে বলে জানালেন। তখন 'এস ফোর্স' এর অধিনায়ক সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক বললেন, 'তাহলে আপনাকে নিজস্ব প্রবেশ পথ বেছে নিতে হবে।' 'এস ফোর্স' অধিনায়ক বললেন, 'তাই হবে'। ভৈরবে পৌঁছে ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার বললেন, 'আপনি ফরটিথ ডিভিশনকে ঘিরে রাখুন।' তিনি বললেন, 'ফরটিথ ডিভিশনকে ঘিরে রাখার জন্য কিছু ফোর্স রেখে আমিও ঢাকা যাব।' ভারতীয় কমাণ্ডার বললেন, 'আমাদের ফোর্স তো হেলিকপ্টারে নরসিংদী যাচ্ছে, আপনি কিভাবে যাবেন?' 'এস ফোর্স' এর কমাণ্ডার বললেন, 'আমি হেঁটে চলে যাব।' নরসিংদী আসার পর ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার আমাদের কমাণ্ডারকে বললেন, 'আপনি নরসিংদী থাকুন আমরা ঢাকা যাচ্ছি।' 'এস ফোস' কমাণ্ডার মেজর সফিউল্লাহ বললেন, 'নরসিংদীতে থাকার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও ঢাকা যাব।' অতঃপর নরসিংদীর সব যানবাহন ভারতীয় বাহিনী নিজেরা নিয়ে ডেমরা পৌঁছেন। আমাদের কমাণ্ডার তার বাহিনীসহ পায়ে হেঁটে ভোলতা পুলের কাছে আসেন। সেখান থেকে কোণাকুণি পথে রূপগঞ্জ দিয়ে শীতলক্ষা ও বালু নদী অতিক্রম করে ডেমরার পেছনে গিয়ে ওঠেন।'[4]

---

3. আমি বিজয় দেখেছি, এস, আর, মুকুল, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮
4. একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হোদা, পৃষ্ঠা-১৫২।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডারদের এ দুর্দশার কাহিনী প্রমাণ করে, আমাদের ছেলেরা সেদিন কিভাবে নিজ দেশে পরবাসী হয়েছিলেন এবং বিদেশী বাহিনী কিভাবে এ দেশের সবকিছুর মালিক হয়েছিলেন। ভারতীয় বাহিনী আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারদের শুধু ঢাকা আসতেই বাধা দেয়নি মুক্তিবাহিনীকে তারা অনুগত বাহিনীর বেশি মর্যাদা দিতে চায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডাররা পর্যন্ত অত্যন্ত অপমানকর আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি বাংলাদেশ সরকার তার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ভারতীয়দের অপমানকর আচরণের শিকার হয়েছেন। এর একটা বেদনাদায়ক বিবরণ দিয়েছেন নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম. এ. জলিল।

তিনি লিখেছেন, "বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক) জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ইত:পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বরিশালে ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে, জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অফিসারের অস্ত্র সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। এ তথ্য লাভের একদিন পরেই আমি কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমে পৌঁছি পশ্চিমবাংলার বারাসাত জেলার হাসনাবাদ বর্ডার টাউনে। ওই অঞ্চলের বিএসএফ এর কমাণ্ডার লে. কর্নেল শ্রী মূখার্জির সঙ্গে হয় প্রথম আলোচনা। কমাণ্ডার মূখার্জি অত্যন্ত সুহৃদ বাঙ্গালী অফিসার। তিনি সর্বান্তকরণেই আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সরাসরি জেনারেল অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন। কর্মকাতার ফোর্ট উইলিয়াম তার হেড কোয়ার্টার। তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। স্বাক্ষী-প্রমাণ দাবি করলেন। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এবং সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে। উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন, তা কেবল ইয়াঙ্কীদের মুখে সদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সোজা ভাষায় তার উত্তর ছিল, 'ঐ দু'টি ব্লাডি ইঁদুরের কথা আমি জানিনা। ওদের কোন মূল্যে নেই আমার কাছে। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে বলো।'

মহা মুশকিল দেখছি। ব্যাটা বলে কি? আমার স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে ব্যক্তি এরূপ কদর্য উক্তি করতে ছাড়েননি, তিনি আমার মত চুনো পুঁটিদের যে কি চোখে দেখবেন তা অনুধাবন করতেই একটা অজানা আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।[5]

জেনারেল অরোরার এ মনোভাবের প্রকাশ ভারতীয় অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মধ্যেও খুব ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে তারা সব সময় তুচ্ছ ও অনুল্লেখযোগ্য করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ইস্টার্ণ কমাণ্ডের মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত শিং মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাকে সারা সীমান্ত জুড়ে 'ঠোকরানো অভিযান' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'ঘুমন্ত সিংহের উপর পিঁপড়ার আক্রমণে'র সাথে তুলনা করেন।[6]

---

5. অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর এম. এ. জলিল, পৃ-২২
6. The Liberation of Bangladesh, Maj: Gen. Sukhwant Singh, page-123

তিনি লিখেন, 'সকল পর্যায়ে 'যুদ্ধ', 'যুদ্ধ' খেলা থেকে যে স্ট্র্যাটেজী অবশ্যই উদ্ভাবিত হল তা হচ্ছে: মুক্তি বাহিনী অপারেশন এর নামে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে সীমান্ত সজীব রেখে পাকিস্তানী বাহিনীকে বের করে নিয়ে আসা।'[7] মুক্তিবাহিনীর যোগ্যতার ওপর কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার দ্বারা সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এ ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর থেকে পাকিস্তানী সামরিক আধিপত্য শিথিল করতে সময় লাগবে।'[8] ভারতের ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লছমন সিংহ এমন একই সুরে কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সেক্টর এর যুদ্ধ ও পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তার বইতে লিখেছেন, 'আমি একমত যে, গেরিলাদের একার পক্ষে পাকিস্তান বাহিনীকে ধ্বংস করা অসম্ভব ছিল, তবে তারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও সংঘাত অব্যাহতভাবে টিকিয়ে রাখতে পারতো।'[9] মিঃ লছমন সিংহ আরো অগ্রসর হয়ে মুক্তিবাহিনীকে ফায়ফরমায়েশ খাটা সহকারীর ভূমিকায় নামিয়ে ছেড়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'তারা (মুক্তিবাহিনী) পথ প্রদর্শক, স্থানীয় বিষয়াদির ব্যাখ্যা দানকারী, তথ্য ও কাজের লোক সংগ্রহকারী হিসেবে অত্যন্ত উপকারী ছিল।'[10]

যারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এমন দৃষ্টিতে দেখত, যারা মুক্তিযুদ্ধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতে ছাড়ত না, সেই ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে ঢাকা আসতে দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যমনি হতে দেবে কেন? তারা হয়তো সংগোপনে এটাই স্থির করে নিয়েছিল যে, যুদ্ধটা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। সম্ভবতঃ এই কারণেই পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে ভারত সরকারই গ্রহণ করে এবং আত্মসমর্পণের শর্ত-শরায়েত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভারত-সরকার ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানেক 'শ'র হাতে অর্পণ করে।[11] জেনারেল মানেক 'শ'ই

---

7. ঐ Page-92
8. ঐ Page-106
9. Indian Sword Strikes in East Pakistan, মেজর জেনারেল লছমন সিংহ, Page-20
10. ঐ Page-181
11. At 6-30 P. M. on December 14, General Niazi... appeared at the American consulate general in Dacca seeking help. He wanted the Indians for ceasfire... V. S. Consul General Herbert Spivak followed protocol to the letter and sent NiaziÕs plea to Washington for rebroadcasting. It was received in the state departiment at 7-45 P. M. Dacca time. The state Department, despite its public pleas for peace, did not expedite General Niazi's ceasfire message. The cable was forwarded to Ambassador Farland in Islamabad, to have him seck with yahya It was 3-30 A. M. in Dacca before Washington received sufficient confirmaion from Islamabad The message was finally sent to Ambassadore keating in New Delhi, Where it was received at 12-56 P. M. It took another hour and a half to decode the message, locate Indian

আত্মসমর্পণের শর্ত-শরায়েত নিয়ে দর কষাকষি করেন। তিনি জেনারেল নিয়াজীর নিছক যুদ্ধ-বিরতীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেন, ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে।[12] বাংলাদেশের চলমান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এবং তা নিয়ে যে আলোচনা চলল এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের যে সিদ্ধান্ত হল তার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর কোন অস্তিত্ব নেই। সবকিছু ঠিকঠাক হল মার্কিন সরকার, ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে। ভারতীয় প্রধান সেনাপতি মানেক শ' পাকিস্তান বাহিনীর জেনারেল নিয়াজীকে পরিষ্কার বলে দিলেন তাকে ও তার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে ভারতীয় বাহিনীর কাছে। বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর কাছে তো নয়-ই এমনকি যৌথ কমাণ্ডের কাছেও নয়। যুদ্ধ বিরতি ও আত্মসমর্পণের কোনো কিছুই বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক ওসমানীকে অবহিত করা হয়নি। সব যখন শেষ তখন ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১২ টার দিকে ভেসে একটা খবরের মত বাংলাদেশ সরকার জানতে পারল যে আজ আত্মসমর্পণ হচ্ছে।[13] এ থেকেও প্রমাণ হয়, ভারত যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্ধ ইত্যাদি নীতিগত ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে কোন পক্ষ হিসেবে গণ্যই করত না। তাদের কাছে ওটা ছিল পাক-ভারত যুদ্ধ।[14] যৌথ কমাণ্ডটা যেন ছিল কৌশলগত ও কূটনৈতিক একটা বর্ম মাত্র।[15] মুক্তিবাহিনীর প্রতি

---

officials and deliver it to them The Anderson paper, pp,-267-268 (মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-২৩৩)

12. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-২৩৪ ২৩৫ Since you (Niazi) have indicated your desire to stop fighting, I (General Manekshaw) expect you to issue orders to all forces unber your command in Bangladesh to ceasfire immediately to my advancing forces wherever they are located... Immediately I receive a positive response from you I Shall direct Gen, Aurora to refrain from all ari and ground action against your 16. 1971. force (Daily Telegraph, Dec.

13. "১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কোলকাতাস্থ থিয়েটার রোডে মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে খবর এসে পৌছল যে, ঢাকার হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদ প্রতি মুহূর্তের খবরের জ উদগ্রীব ছিলেন। এমন সময় খবর এলো, আজ বিকেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় আত্মসমর্পণ হবে।" আমি বিজয় দেখেছি-এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা-৩০৮

14. লক্ষণীয়, ভারতের ইস্টার্ণ নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডার ইন-চিফ ভাইস এডমিরাল এস. কৃষ্ণাণ-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের ওপর লিখিত নো ওয়ে বাট সারেন্ডার গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিলঃ An account of the Indo-Pakistan war in the Bay of Bengal? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভারতের মিঃ প্রাণ চোপরার লিখিত একটা বইয়ের নামঃ The Second Revolution of India.

15. আসলে শুধু সামরিক দিক বিবেচনা করলে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত বাংলাদেশ বাহিনীর জন্য এ ধরনের পৃথক মোতায়েন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এটা দেখানো দরকার ছিল যে, বৃহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বাহিনী ভিন্নভাবে যুদ্ধ করছে। দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ-মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং, পৃষ্ঠা-৩৬
তা ছাড়া তার (সুখওয়ান্ত সিং) গ্রন্থে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক এবং প্রবাসী সরকারের নেতৃবর্গের কোনো ভূমিকাই স্বীকার করা হয়নি। তার বর্ণনা মতে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে লেঃ জেনারেল কে কে সিং এর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটা টিম। (মাসিক ডাইজেস্ট, জানুয়ারি, ১৯৮৬)

তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদাকর ব্যবহার দেখে এটাই মনে হয়েছে।

তবে মুক্তিবাহিনীর প্রতি তারা এ মানসিকতা পোষণ করলেও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও মর্যাদাবোধকে তারা ভয় করত। জেনারেল ওসমানী তাঁর দেশ, তাঁর বাহিনীর মর্যাদার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ভারতীয় বাহিনীর মিলিটারি অপারেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল সিংহ বলেছেন, 'তিনি (জেনারেল ওসমানী) মুক্তিযুদ্ধকালে যেখানেই গিয়েছেন একটা স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।'

আমার মনে আছে, একবার একজন ভারতীয় আর্মি কমাণ্ডার তাকে অভ্যর্থনার জন্য রানওয়েতে তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমান অবতরণ করাতে অস্বীকার করেন, যদিও তার বিমান আগেই এয়ার ফিল্ডে এসে পড়ে। বেচারী পাইলটকে প্রায় ১০ মিনিট আকাশে চক্কর দিতে হয়। সাথের বিমানের আরোহী ভারতীয় কমাণ্ডার আগে নেমে তাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরেই তার বিমান অবতরণ করে।

জেনারেল ওসমানীর মনোভাব ছিল যে, তার দেশের জন্য সাহায্য প্রয়োজন, ভিক্ষা নয়। যদিও তিনি জুনিয়র র‍্যাংকের ছিলেন তবুও মর্যাদাও যেন কোন দিক দিয়ে ভারতীয় প্রতিপক্ষের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলেন বলে মনে করতেন না।[16]

জেনারেল ওসমানী সাহায্য ছাড়া অন্য কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে চাইতেন না। শুধু সিংহ-ই বলেছেন, 'নিজ দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর যে ভয়ংকর অহংকার ছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এটা চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংযুক্ত বলে বিবেচিত হোক এটা তিনি কিছুতেই চাইতেন না।'[17] জেনারেল অরোরার একক নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড গঠন করাকেও তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ক্ষমতা ও তার ছিল না। তাই দেখা যায়, 'যৌথ কমাণ্ড গঠন করার পরও তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি কমাণ্ড করতেন। কিন্তু কোন বেতার যন্ত্র না থাকায় সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।'[18] ১৮

মেজর জেনারেল লছমন সিংহ এর অভিযোগ থেকেও এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেন, 'মুক্তিবাহিনী তার কমাণ্ডে আসলেও তারা অনেক সময় তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কাজ করতো এবং এর ফলে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দিত।' এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন পরিষ্কার নির্দেশ তিনি পাননি।[19] কথাটাকে আরো পরিষ্কার করে তিনি লিখেছেন, 'শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সরাসরি জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এসেছে যা তাদের দেওয়া আমাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশের সাথে সবসময় সঙ্গতিপূর্ণ হতো না।'[20]

দেশ ও জাতির মর্যাদার ব্যাপারে আপোসহীন ও স্বাধীনচেতা মুক্তিযুদ্ধের যে সর্বাধিনায়ক

---

16. দ্য লিবারেশন অফ বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিংহ, পৃষ্ঠা-৩৪
17. ঐ পৃষ্ঠা-৩৪
18. একাত্তররের রণাঙ্গন, শামসুল হোদা, পৃষ্ঠা-১৮৫
19. Indian Sword Strikes in East Pakistan, মেজর জেনারেল লছমন সিংহ, পৃষ্ঠা-১৭৮
20. ঐ পৃষ্ঠা-১২১

ওসমানী তাকে ঢাকায় নিয়াজীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ডাকা হবে কেন? ভারতীয়রা ভয় করেছে যে, নিজ দেশে ভারতীয় জেনারেলের কাছে পরাজিত শত্রু পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য বসে বসে দেখতে জেনারেল ওসমানী কিছুতেই রাজি হবেন না এই অসংগত ব্যবস্থা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। এজন্যই আত্মসমর্পণের গোটা ঘটনা তার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে এবং কৌশলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।[21] এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শত অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল ওসমানী কোন দিনই মুখ খোলেননি। বলা হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত নবীন দেশের কর্মবীর হিসাবে হাজারো জটিল সমস্যার সমাধান চিন্তায় ব্যাপৃত শেখ মুজিবুর রহমান পুরোনো দিনের কোন কথা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হোক এটা হয়তো অভিপ্রেত মনে করেননি। আর তাই হয়তো জেনারেল ওসমানীকে কিছু কিছু কথা প্রকাশ না করার তিনি অনুরোধ করেছিলেন। একদিকে বঙ্গোপসাগর আর অপর তিন দিকে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে হয়তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সত্য কথা সব সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যেহেতু জেনারেল ওসমানী 'বঙ্গবন্ধু'কে কথা দিয়েছিলেন কিছু কথা প্রকাশ করবে না তাই তিনি নীরব রইলেন। হাফ ট্রুথ প্রকাশ করার লোক তিনি ছিলেন না।[22]

---

21. জেনারেল ওসমানি ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটিতে কেন হাজির থাকেননি তার আর একটা বিবরণ পাওয়া গেছে সাংবাদিক (বর্তমানে দৈনিক মানব জমীন)' সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি বলছেন-নয় মাস আমরা যুদ্ধ করেছি পাক হানাদার বাহিনীর সাথে।... পাক বাহিনী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি আধুনিক সৈন্য। মুজিবনগর সরকারের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এ নিয়ে বিতর্ক ১৯৭২ সাল থেকেই। জেনারেল ওসমানি জীবিত থাকা অবস্থায় বলে যাননি কেন তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেননি। তৎকালীন সরকারও কোনো সময় বলেননি।
    ...১৯৭১ সালের অক্টোবর। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকার একটি সমঝোতায় এলেন। সাতটি বিষয়ে সমঝোতা। এ দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ভারতের একজন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের ভয়াবহতা ভেবে এ অনুষ্ঠানেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এ চুক্তি। মুজিবনগর সরকারের অনেকেই জানতেন না। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মরহুম তাজউদ্দীন প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ই ছিল চুক্তির প্রধান লক্ষ্য। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধ করেনি এমন কর্মকর্তাদের চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হবে। অভিজ্ঞ কর্মচারীর শূন্যতা পূরণ করবে ভারতীয় কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তা। লক্ষ্য করে দেখবেন স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার ঢাকা এসেছিলেন।
    বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী থাকবে। যা পরে রক্ষীবাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছিল। প্রশিক্ষণে ছিলেন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাগণ। সামরিক সমঝোতার মধ্যে আরও ছিল-বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনী থাকবে। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ হবে। ৭২ সনের নভেম্বর থেকে এর কাজ শুরু হবে।
    বাণিজ্যিক সমঝোতা ছিল খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা। সীমান্তের তিন মাইল জুড়ে চালু হবে খোলা বাজার। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শুধু বছর শেষে হিসেব-নিকেশ হবে। প্রাপ্য মেটানো হবে পাউণ্ড-স্টার্লিং এর মাধ্যমে। বিদেশ বিষয়ে ভারত যা বলবে তাই মেনে চলতে হবে। সাউথ ব্লকের এ্যানেকস হবে সেগুন বাগিচা। এককথায় বলা চলে উল্লিখিত চুক্তি বলে ভারত বাংলাদেশের সামরিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ের কর্তৃত্ব পেয়ে যায়। পাকিস্তানের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কসহ প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পাবেন না। এ কারণেই জেনারেল ওসমানি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে রাজি হননি। (শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন-মতিউর রহমান চৌধুরী, নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ি ৫০, সড়ক ২ এ, ধানমন্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাগজ, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি, ১৯৯০)
22. 'জেনারেল ওসমানি নিরব রইলেন কেন?' এস, মমিনল্লাহ, মাসিক ডাইজেষ্ট, জানুয়ারী, ১৯৮৬

কিন্তু অনেক পরে অবশেষে তিনি মুখ খুলতে চাইলেন। তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন অন্ধকারের ঘটনাগুলো। ১৯৮৩ সালের ২৪ নভেম্বর দৈনিক বাংলা পরিবারের সাপ্তাহিক বিচিত্রা এক সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় তাকে প্রশ্ন করে, 'পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ আপনার কাছে হলো না কেন?' জেনারেল ওসমানী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি,[23] যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি একটা বই লিখছি, তাতে সব ঘটনাই পাবেন। চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে সিএমএইচ হাসপাতালে দেয়া জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে অসুস্থ জেনারেল জানান, 'আমার একটা দুঃখ আছে, আমি বাংলা ভাষা দিয়ে লিখতে পারিনা। ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করেছি তাই। তবে আমি বসে নেই আমি অনেক ঘটনার নোট টুকে রেখেছে। ইংবানীতে। একটা আত্মজীবনী লিখব। অনেক অজানা ইতিহাস থাকবে তাতে। জেনারেল ওসমানীর জীবনী গ্রন্থ হবে না সেটা, সেটা হবে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস।

দেশবাসীর কাছে আমি ঋণী। অনেক আগের পাওনা তাদের। বইটা শেষ করে প্রকাশ না করতে পারলে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার লাশের মত অনেক অজানা কথা, অনেক অপ্রকাশিত ইতিহাস কবরের মাটিতে চাপা পড়বে। এটা হওয়া উচিত না।

ভাবছি, ভালো হয়ে ফিরে এসে অবশ্যই বইটি লিখবো। আর কিসের ভয়? কারে ভয়? এক 'বঙ্গবন্ধুকে' ভয় করতাম।[24]

---

23. অনেক ঘটনার মধ্যে দিল্লির সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গোপন চুক্তিও একটা।
সাংবাদিক জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী গোপন চুক্তির যে বিবরণ ওপরে দিয়েছেন, তার চেয়েও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা চলাকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লি মিশন প্রধান, স্বাধীনতার পর দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার, পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শেখ হাছিনা সরকারের সময়ে (১৯৯৬-২০০১) জাতীয় সংসদের স্পিকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্টে আসেন। ওই চুক্তি বা অ্যাগ্রিমেন্ট অনুসারে দু-পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন, তা হলো যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্তকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকিদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদের বের করে দেন।
সামরিক সমঝোতা হলো-বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে, তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুননীরিক্ষণের জন্য দু-দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না।
অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।
ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উৎস। আর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক সমঝোতাটি হলো-সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে। চুক্তির এ অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানানো হলে তীব্রভাবে তিনি ফেটে পড়েন।

24. এ ভয় কিন্তু তাকে নীতি যুক্ত করতে পারেনি। শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালে যখন বাকশাল গঠন করেন এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন তখন জেনারেল উসমানী এর প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

সেই লোকটারে কথা দিয়েছিলাম কিছু কথা লিখব না, বলবো না। তিনিও নেই আমার দেয়া কথাও নেই। এসব কথা বর্তমান ও আগামী দিনের নাগরিকদের জানা দরকার। হ্যাঁ, আমি লন্ডন থেকে ফিরেই লিখব নিয়মিত।[25]

কিন্তু জেনারেল ওসমানী আর ফিরে আসেননি। ফিরে এলো তার লাশ। এই সাক্ষাৎকার দেয়ার মাত্র আড়াই মাস পরে ফেব্রুয়ারি, ৮৪ তে তিনি লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। তিনি জাতিকে যা জানাতে চেয়েছিলেন তা অজানাই রয়ে গেল। যা বলা তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন তা তার না বলাই রয়ে গেল। অজানা রয়ে গেল, কি ছিল সে ষড়যন্ত্র, যার শিকার হয়েছিল দেশ, দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তিনি।

১১ নং সেক্টরের অধীনস্থ মুক্তিযুদ্ধের ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের সৈয়দ আবুল হোসেন রাজার একটি উক্তি এখানে বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দিল্লিতে বাংলাদেশের অস্থায়ী কেবিনেটের যে সভা হয়,[26] তাতে যোগদান শেষে দেশে ফিরে জেনারেল ওসমানী রণাঙ্গনে দেওয়া তার ভাষণে আমাদের বলতেন, 'আজ থেকে আমাদেরকে তিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এর একটি পাক-হানাদার বাহিনী, আরেকটি হলো আমাদের যুদ্ধকালীন সরকারের দু'টি বিভক্ত শিবির। কিন্তু তৃতীয় শত্রুর কথা তিনি মোটেই বললেন না। উনি ব্যথিত সুরে বলতেন, প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমিকে আজাদ করার জন্য আমাদের নেতৃত্বে আজ যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের নিকট আমার সতর্কবাণীঃ আমরা কারো করুণার পাত্র রূপে যুদ্ধ করছি না।'[27]

তৃতীয় শত্রুটির নাম সেদিন জেনারেল ওসমানী ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বলতে না পারলেও সে শত্রুকে আমরা চিনি। কিন্তু কি জেনে, কি দেখে, কি বুঝে, কোন কারণে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী সেদিন তিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলেছিলেন, তা আর কোনদিনই জানা যাবে না। জানা যাবে না কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। এ জানাটা বাদ দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাস নামের মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা শুনে কি জাতির যে প্রয়োজন, তা মিটতে পারে?[28] ■

25. বিচিত্রা, ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৩
26. ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধী মস্কোতে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর আগে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সম্ভবতঃ ভারত বাংলাদেশের সাথে ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে (উল্লেখ্য এরই বোধ হয় ফলোআপ ছিল অক্টোবরে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত অধীনতামূলক মিশ্রতার ৭ দফা গোপন চুক্তি।)
27. 'আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানী না থাকার নেপথ্য কথা', গোলাম ফারুক, সাপ্তাহিক বিক্রম, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
28. "এই যে এত স্বাধীনতা যুদ্ধের বই বাজারে, আমি তার অনেকগুলোই দেখেছি। পাবলিক লাইব্রেরীতে গেছি– দেখেছি সব মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা"। –জেনারেল ওসমানী, সাক্ষাৎকার, বিচিত্রা, ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৩

ইসলামের রাজনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামের রাজনীতির বুনিয়াদ তিনটি মূলনীতির উপর স্থাপিতঃ তাওহীদ, নবুয়াত এবং খিলাফত। এ তিনটি মূলনীতিকে বিস্তৃতভাবে বুঝতে না পারলে ইসলামী রাজনীতির বিস্তারিত বিধান হৃদয়ংগম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কাজেই সর্বপ্রথম আমি এ তিনটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

তাওহীদ

তাওহীদের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মানুষ সহ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং একমাত্র মালিক। প্রভুত্ব, শাসন এবং আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র তারই। কোনো কিছু করার আদেশ দেয়া এবং কোনো কাজের নিষেধ করার ক্ষমতা শুধু তারই কাছে বর্তমান। আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষ কাউকে শরীক করবে না। আমরা যে সত্তার দরুন বেঁচে আছি, আমাদের যে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বল-শক্তি দ্বারা আমরা কাজ করি, দুনিয়ার সকল জিনিসেরই উপর আমাদের এই যে অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতা এবং স্বয়ং এ বিশ্ব-জাহানের উপর আমরা যে আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করি-তার কোনোটাই আমাদের উপার্জিত নয়। এর সৃষ্টি ও অবদানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। আমাদের নিজেদের এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং আমাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির সীমা নির্ধারণ করা আমাদের করণীয় কাজ নয়, আর না এতে অন্য কারোও একবিন্দু অধিকার আছে। এ সবকিছু শুধু সেই আল্লাহর করণীয় যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের এত শক্তি ও স্বাধীনতা দান করেছেন এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসকে আমাদের ভোগ-ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। তাদের এ ধারণা মানবীয় প্রভুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। একজন ব্যক্তি মানুষই হোক কিংবা একটি পরিবার বা একটি শ্রেণী হোক কিংবা মানুষের একটি বড় দল, একটি জাতি কিংবা সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ার মানুষ হোক, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আদেশই হচ্ছে মানুষের জন্য একমাত্র আইন।

নবুয়াত

আল্লাহ তায়ালার এ আইন যে উপায়ে মানুষের নিকট এসে পৌঁছেছে, তার নাম নবুয়াত। এ নবুয়াতের ভিতর দিয়ে আমরা দুটি জিনিস লাভ করে থাকি। এক: কিতাব-যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের আইন-কানুনের বিবরণ দিয়েছেন। দুই: সেই কিতাবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-যা রাসূল সা. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন। যে মূলনীতির উপর মানুষের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালা সবই তাঁর কিতাবে এক এক করে

বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল সা. আল্লাহর কিতাবের সেই উদ্দেশ্য অনুসারে কার্যকরীভাবে জীবনযাপনের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। আর তার আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা বলে দিয়ে আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ রূপে উপস্থিত করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় এ দুটি জিনিসের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে শরীয়াত। ইসলামী রাষ্ট্র এ বুনিয়াদী নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খিলাফত

এখন খিলাফতের কথা আলোচনা করা যাক। আরবী ভাষায় এ শব্দ প্রয়োগ করা হয় প্রতিনিধিত্বের অর্থ বুঝার জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার দেয়া স্বাধীনতা অনুযায়ী কাজ করবে। আপনি যখন কারো উপর আপনার জায়গা-জমির ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করেন, তখন চারটি কথা আপনার মনে অবশ্যই বর্তমান থাকে। প্রথম এই যে, জমির প্রকৃত মালিক সে নয়, আপনি নিজে। দ্বিতীয়, আপনার জমিতে সে কাজ করবে আপনারই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে। তৃতীয়, আপনি তাকে কাজকর্ম করার যে সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকেই তাকে কাজ করতে হবে-আপনার দেয়া স্বাধীনতাকে সেই সীমার মধ্যেই তার ব্যবহার করতে হবে। আর চতুর্থ এই যে, আপনার জমিতে তাকে তার নিজের নয়-আপনার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। এ চারটি শর্ত প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে, 'প্রতিনিধি' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই আপনা-আপনিই মানুষের মনে এটা জেগে উঠে। আপনার কোনো প্রতিনিধি যদি এ চারটি শর্ত পূর্ণ না করে তবে আপনি অবশ্যই বলবেন সে প্রতিনিধিত্বের সীমালংঘন করেছে এবং সে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যা 'প্রতিনিধির' শব্দের অর্থেই নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার 'প্রতিনিধি' বলে নির্দিষ্ট করেছে। এ খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যেই উক্ত চারটি শর্ত অনিবার্য রূপে বিদ্যমান। ইসলামী রাজনীতির এ মহান আদর্শ অনুসারে যে রাষ্ট্র কায়েম হবে, মূলত তা হবে আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অধীন মানুষের খিলাফত। আল্লাহর এ রাজ্যে তাঁরই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষের একমাত্র কাজ।

খিলাফতের এ ব্যাখ্যা প্রসংগে আর একটি কথা বুঝে নেয়া দরকার। তা এই যে, ইসলামের এ রাজনৈতিক মত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা কোনো পরিবার বা কোনো শ্রেণী বিশেষকে 'প্রতিনিধি' বলে আখ্যা দেয়নি, বরং মানুষের সেই গোটা সমাজকেই এ খিলাফতের পদে অভিষিক্ত করেছে, যারা তাওহীদ ও রেসালাতের মূলনীতিগুলো স্বীকার করে খিলাফতের উল্লেখিত শর্তাবলী পূর্ণ করতে প্রস্তুত হবে, এমন সমাজই সমষ্টিগতভাবে খিলাফতের অধিকারী-এ খিলাফত এহেন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য।

গণতন্ত্র

ইসলামের রাজনীতিতে এখান থেকেই শুরু হয় গণতন্ত্রের পদক্ষেপ। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই খিলাফতের অধিকারী ও আযাদীর মালিক। এ অধিকার ও স্বাধীনতায় সমগ্র মানুষই সমান অংশীদার। এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো মানুষ

অন্য কোনো মানুষকে তার এ অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্ব হতে বঞ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খলা বিধানের জন্য যে সরকার গঠিত হবে তা এ সমাজেরই ব্যক্তিদের মত অনুযায়ী গঠন করতে হবে। এরাই নিজ নিজ খিলাফতের অধিকার হতে এক অংশ সেই সরকারকে দান করবে। রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাদের মতের মূল্য অনিবার্যরূপে স্বীকৃত হবে। তাদেরই পরামর্শক্রমে গভর্নমেন্ট চলবে। তাদের আস্থা যে ব্যক্তি লাভ করতে পারবে, সে তাদের সকলের তরফ হতে খিলাফতের বিরাট কর্তব্যকে পূর্ণ করবে। আর যে তাদের আস্থা হারাবে, সে অবশ্যই খিলাফতের পদ হতে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবে। এ দিক দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। একটি গণতন্ত্র যতদূর পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে পারে, এটা ঠিক ততখানিই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। কিন্তু ইসলামের এ গণতন্ত্র পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে মূলতই সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য এ দিক দিয়ে যে, পাশ্চাত্য রাজনীতি 'জনগণের প্রভুত্বকে'-কে বুনিয়াদরূপে স্বীকার করে, কিন্তু ইসলাম স্বীকার করে জনগণের 'খিলাফত'। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণই হচ্ছে বাদশাহ, আর ইসলামের দৃষ্টিতে বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর, জনগণ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণ নিজেরাই দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা করে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সেই শরীয়াত বা আইনের অনুসরণ করে চলতে হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে গভর্নমেন্টের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছাকে পূর্ণ করা আর ইসলামী গভর্নমেন্ট এবং তার প্রতিষ্ঠাতা জনগণ সকলেরই কতর্ব্য হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে সার্থক করা। মোটকথা, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হচ্ছে আযাদ, নিরঙ্কুশ ও বল্লাহারা প্রভুত্ব-যারা নিজ অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ভোগ করে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত-ইসলামী গণতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইনের অনুসরণ করা। এখানে মানুষ তাঁর অধিকার ও স্বাধীনতাকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করবে।

অতপর আমি তাওহীদ, রেসালাত ও খিলাফতের ভিত্তিতে স্থাপিত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট চিত্র অংকন করবো।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন শরীফে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তা সেসব কল্যাণময় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে, বিকাশ দান করবে এবং উৎকর্ষ সাধন করবে, যে সবের দ্বারা মানুষের জীবনকে আল্লাহ তায়ালা সজ্জিত ও ভূষিত দেখতে চান। আর সেসব অকল্যাণ ও পাপ অনুষ্ঠানকে বাতিল করবে, পরাজিত করবে এবং নিঃশেষে বিলীন করবে। মানুষের জীবনে যে সবের স্পর্শ মাত্রকেও আল্লাহ তায়ালা পসন্দ করেন না ইসলামের রাজ্যের শৃঙ্খলা সম্মিলিত ইচ্ছা-বাসনা চরিতার্থ করাও এর লক্ষ্য নয়। ইসলাম রাষ্ট্রের সম্মুখে এমন এক উচ্চতম ও উন্নততর লক্ষ্য উপস্থিত করে, যা অর্জন করা একান্তভাবে কর্তব্য। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যে কল্যাণের উৎকর্ষ দেখতে চান তাকে বিকশিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে হবে। আর ধ্বংস ও উচ্ছৃঙ্খলতার এবং এমন সমস্ত উপায়ের উৎসমুখ চিরতরে বন্ধ করতে হবে যা আল্লাহ

তায়ালার দৃষ্টিতে তাঁর এ রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে, তাঁর সৃষ্টি মানব জাতির জীবন নষ্ট করতে পারে। এ লক্ষ্য উপস্থিত করার সাথে সাথে ইসলাম আমাদের সামনে ভাল-মন্দ উভয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পেশ করেছে। তাতে বাঞ্ছিত কল্যাণকে এবং অকল্যাণগুলোকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এ চিত্র সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক যুগে এবং সকল প্রকার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই তার নিজ সংশোধনী প্রোগ্রাম রচনা করতে পারে।

শাসনতন্ত্র

মানব জীবনে প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায়ই চারিত্রিক রীতিনীতিগুলোকে পরিপূর্ণরূপে পালন করা ইসলামের চিরন্তন দাবী। এ কারণে এটা নিজ রাষ্ট্রের জন্য এ সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এর রাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ, সুবিচার, সততা এবং খাঁটি ঈমানদারীর উপর স্থাপিত হবে। এটা স্বাদেশিক, প্রশাসনিক বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার খাতিরে মিথ্যা, প্রতারণা এবং অবিচারের প্রশ্রয় দিতে কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত নয়। দেশের অভ্যন্তরে শাসক ও শাসিতদের মধ্যস্থিত সম্পর্কই হোক, আর দেশের বাইরে অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কই হোক উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম সত্যতা, বিশ্বাসপরায়ণতা এবং সুবিচারের জন্য সমস্ত প্রকারের স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত। মুসলিম ব্যক্তিদের মত মুসলিম রাষ্ট্রকেও এটা এজন্য বাধ্য করে যে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করতে হবে, লেন-দেন ঠিক রাখতে হবে এবং যা বলবে তা করতে হবে, নিজের প্রাপ্য আদায় করার সাথে সাথে নিজের কর্তব্যকে স্মরণ করতে হবে, যা করবে তা বলবে এবং অন্যের দ্বারা তার কর্তব্য আদায় করার প্রাপ্য (হক) ভুলে যেতে পারে না। শক্তিকে যুলুমের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে তাকে সুবিচার কায়েম করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরের ন্যায্য অধিকারকে সবসময়ই হক বলে মনে করতে এবং তা আদায় করতে হবে। শক্তিকে মনে করতে হবে আল্লাহ তায়ালার আমানত এবং এ দৃঢ়-বিশ্বাস সহকারে তাকে প্রয়োগ করতে হবে যে, এ আমানতের পুরোপুরি হিসেব তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অবশ্যই দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর বিশেষ একটা অঞ্চলে স্থাপিত হয়ে থাকলেও মানবীয় অধিকারগুলোকে সে কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না-নাগরিকত্বের অধিকারেও নয়। শুধুমাত্র মানবতার দিক দিয়েই ইসলামী মানুষের জন্যে কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করে এবং সকল সময়ই সেগুলোকে পূর্ণরূপে রক্ষা করার আদেশ দেয়। সেই মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে বাস করুক কিংবা এর বাইরে বাস করুক, সে মিত্রই হোক কিংবা শত্রু তার সাথে সন্ধি থাকুক কিংবা যুদ্ধই চলতে থাকুক-মানুষের রক্ত সকল সময়ই সম্মান পাবার যোগ্য, বিনা কারণে কিছুতেই মানুষের রক্তপাত করা যেতে পারে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং আহত লোকদের উপর কোনোক্রমেই আক্রমণ করা যেতে পারে না। নারীর সতীত্ব চিরদিনই সম্মানিত ও সুরক্ষণীয়, কোনো কারণেই তা নষ্ট করা যেতে পারে না। ক্ষুধার্তের জন্য অন্নের, বস্ত্রহীনদের জন্য বস্ত্রের এবং আহত কিংবা রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে-সে ব্যক্তি শত্রু পক্ষেরই হোক না কেন। এ কয়টি এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি অধিকার ইসলাম মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্রে এ সকলকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা

হয়েছে। তারপর নাগরিক অধিকারকে ইসলাম কেবল মাত্র সেসব লোকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়নি যারা রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে বরং প্রত্যেক মুসলমান-দুনিয়ার যে কোনো অংশেই তার জন্ম হোক না কেন-ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই এর নাগরিক হয়ে যায় এবং সেই দেশের জন্মগত নাগরিকদের সমতুল্য অধিকার তাকে দান করা হয়। দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র যত সংখ্যকই হোক না কেন এদের সব কয়টির মধ্যে নাগরিক অধিকার হবে সর্বসম্মিলিত। কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে মুসলিম ব্যক্তির 'পাসপোর্ট'-অনুমতিপত্রের আবশ্যক হবে না। কোনো বংশীয়, জাতীয় কিংবা শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে পারবে।

যিম্মিদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্য ইসলাম কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে তা অবশ্য বিধিবদ্ধ থাকবে (যিম্মীর শাব্দিক অর্থ যার যিম্মা বা দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়)। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেই তারা যিম্মী নামে অভিহিত হয়। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ অমুসলিমদেরকে বলা হয় যিম্মী। যিম্মীর জান-মাল ও মান-সম্মান সবই একজন মুসলিম নাগরিকের জান-মাল ও মান-সম্মানের মতই মর্যাদা পাবে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনের বেলায় মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যিম্মীদের 'পার্সনাল-ল' অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতায় ইসলামী রাষ্ট্র কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। যিম্মীদের মন, ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা-উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যিম্মী তার ধর্ম প্রচারই শুধু নয়, আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে ইসলামের সমালোচনাও করতে পারবে।[1]

ইসলামী শাসনতন্ত্রে অমুসলিম প্রজাদেরকে এগুলো এবং এ ধরনের আরো অনেকগুলো অধিকার দান করা হয়েছে। এ অধিকারগুলো চিরস্থায়ী। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে তারা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের এ অধিকার কিছুতেই হরণ করা যেতে পারে না। অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র এর অধীনে মুসলিম প্রজাদের উপর যতই যুলুম করুক না কেন, তার প্রতিশোধ হিসেবে একটা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এর অধীন অমুসলিম প্রজাদের উপর শরীয়তের খেলাফ বিন্দুমাত্র হস্তেক্ষেপ করা বৈধ নয়। এমনকি আমাদের সীমান্তের বাইরে সমস্ত মুসলমানকে যদি হত্যাও করে ফেলা হয়, তবুও আমরা আমাদের সীমার মধ্যে একজন যিম্মীর অকারণে রক্তপাত করতে পারি না।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব

1. এ সম্পর্কে 'ইসলামে মোরতাদের শাস্তি' বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝলেই যথেষ্ট হবে যে, ইসলামী বিধানে অমুসলিমকে অনুকূল বা প্রতিকূল আলোচনা সমালোচনার যতটা অধিকার দেয়া হয়েছে, তা কিছুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। তবে রাষ্ট্রীয় আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকেই তাদের এ আলোচনা কাজ করতে হবে। মোটকথা, একজন যিম্মীর এ অধিকার ইসলাম অবশ্য স্বীকার করে যে, সে যুক্তিসংগতভাবে স্বীয় ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা বা প্রচার করতে পারে যদিও সে ইসলামকে স্বীয় ধর্ম বলে স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পণ করা হয়। এ আমীরকে 'সদরে জমহুরিয়া' বা রাষ্ট্র পরিষদের সভাপতির সমান মনে করা যেতে পারে। আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে এমন সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের ভোট দেবার অধিকার থাকে যারা শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে। আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) নির্বাচনের মূলনীতি এই যে, ইসলামের মূল ভাবধারার অভিজ্ঞতা, ইসলামী স্বভাব-প্রকৃতি, আল্লাহর ভয় এবং রাজনৈতিক প্রতিভার দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সমাজের অধিকাংশ লোকের আস্থাভাজন হবে। এমন ব্যক্তিকেই আমীর নির্বাচন করতে হবে। তারপর সেই আমীরের সাহায্যের জন্য একটি 'মজলিশে শূরা' বা পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। 'মজলিশে শূরার' পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শৃঙ্খলা রক্ষা করা আমীরের কর্তব্য হবে। আমীরের প্রতি যতদিন পর্যন্ত জনগণের আস্থা থাকবে ততদিনই সে আমীর থাকতে পারবে। আস্থা হারিয়ে ফেললে তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। আর যতদিন তার প্রতি লোকদের আস্থা থাকবে, গভর্নমেন্টের অধিকার ও কর্তৃত্ব তার হাতে থাকবে। আমীর এবং তাঁর সরকারের প্রকাশ্যে সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন রচনা করা হবে শরীয়াতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ শুধু অনুসরণ ও প্রতিপালনের জন্যই। কোনো আইন পরিষদ তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ এবং রাসূলের যেসব হুকুমের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা হবে, তাতে শরীয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা শুধু সেসব লোকের কাজ, যারা শরীয়াতের জ্ঞানে পরিপূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন। কাজেই এ ধরনের কাজ 'মজলিশে শূরা' হতে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটির নিকট সোপর্দ করতে হবে। তারপর মানুষের দৈনন্দিন কাজ কারবারের এমন অনেক ক্ষেত্রও থাকে, যে সম্পর্কে শরীয়াত নির্দিষ্ট কোনো হুকুম দেয়নি। কাজেই এ ব্যাপারে 'মজলিশে শূরা' দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আইন রচনা করতে পারে।

আদালত

ইসলামী আদালত শাসন কর্তৃপক্ষের অধীন নয়; বরং তা সরাসরিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং একে আল্লাহ তায়ালরই সামনে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আদালতের বিচারকদেরকে যদিও ইসলামের জীবন পদ্ধতি শাসন কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে; কিন্তু এক ব্যক্তি যখন আদালতে বিচারকের পদে বসবে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার আইন অনুসারে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষ ইনসাফ করবে। তার ইনসাফের হাত হতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও বাঁচতে পারে না। এমন কি, হুকুমাতের প্রধান নেতাকেও আসামী কিংবা ফরিয়াদী হয়ে বিচারকের সামনে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে- যেমন করে দাঁড়াতে হয় রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিককে। ■

- লেখাটি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত এবং মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' বই থেকে সংকলিত।

নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ : ইসলামে তার প্রতিকার

ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮. তালাককে তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ

জাহেলী যুগে স্ত্রীদেরকে নির্যাতনের আরেকটি অস্ত্র ছিল তালাক। তালাকের অপব্যবহার করে স্ত্রীদেরকে নির্যাতন করা হতো। একজন পুরুষের তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিল। ফলে তালাক দেওয়ার পর 'ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার কিছু পূর্বে স্ত্রীকে ফেরৎ নিত এবং আবার তালাক দিত। এভাবে সে বারবার স্ত্রীকে তালাক দিত এবং বারবার ফেরৎ নিত। এভাবে স্ত্রীকে নির্যাতন করাই ছিল উদ্দেশ্য। স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদাও দিত না আবার ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বিবাহের সুযোগও দিত না।

হিশাম ইবন 'উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে কখনও তালাকও দেব না আবার কখনও আশ্রয়ও দেব না। স্ত্রী বলল, সেটা কিভাবে? সে বলল, আমি তোমাকে তালাক দেব, আর যখন 'ইদ্দত ঘনিয়ে আসবে তখন তোমাকে ফেরৎ নেব। তখন স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে তা বর্ণনা করলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন[১],

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"তালাক দু'বার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় ভালভাবে রাখতে হবে অথবা সুন্দরভাবে বিদায় দিতে হবে। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ, তা ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তবে তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা রেখা ঠিক রাখতে পারবেনা। সেমতে তোমরাও যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবেনা, তাহলে সে অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; এগুলি হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা অতিক্রম করনা এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২২৯)

১. তাফসীরু ইবনি কাছীর, খ, ১, পৃ. ৫৯২।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা তালাককে তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন এবং তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এ বিধানের মাধ্যমে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা একটি অন্যায় ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায় এবং স্ত্রীরা এর কুফল থেকে মুক্তি লাভ করে।

৯. 'ইদ্দত তিনটি

তালাকের পর নারীদের পুন:বিবাহের জন্য একটি সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এটিকে 'ইদ্দত বলে। ইসলাম এ প্রতিক্ষার কালকেও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং সেটিকে হিসাবে রেখে তালাক দিতে বলেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ

"হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তালাক দেবে 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'ইদ্দত গণনা করবে।" (৬৫, সূরা আত্‌তালাক : ১)

তালাককে যেমন তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে 'ইদ্দতকেও তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এরফলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবেনা; যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে থাকে। আর তারা যদি এর মধ্যে সংশোধন করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের স্বামীই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার।" (সূরা আল্‌বাকারা : ২২৮)

এটি হলো সে সকল নারীর 'ইদ্দত, যাদের মাসিক হয়। আর যাদের অধিক বা কম বয়সের কারণে মাসিক হয়না, তাদের 'ইদ্দত হলো তিন মাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّئِ لَمْ يَحِضْنَ

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুমতি হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করলে (জেনে রাখ) তাদের 'ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ 'ইদ্দতকাল হবে।" (৬৫, সূরা আত্‌তালাক : ৪)

অপর দিকে গর্ভবতি নারীদের 'ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

আর গর্ভবর্তী নারীদের 'ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (৬৫, সূরা আত্‌তালাক : ৪)

এভাবে ইসলাম নারীদের 'ইদ্দতকাল সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের পরবর্তি বৈবাহিক জীবন শুরুর পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছে।

১০. বিধবার 'ইদ্দত ৪ মাস ১০দিন

ইসলাম পূর্ব যুগে নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারের কারণে নারীরা নির্মম নির্যাতনের শিকার হতো। সে সময় কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে দীর্ঘ এক বছর 'ইদ্দত পালন করতে হতো।

قَالَتْ زَيْنَبُ، وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ»

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ»

যায়নাব (রা.) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা.)কে বলতে শুনেছি, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে আর তার চোখে রোগ হয়েছে, আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না। মহিলাটি দু'বার বা তিন বার বললো এবং প্রতিবারই তিনি বললেন, না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এখন তো 'ইদ্দত চার মাস দশ দিন মাত্র। অথচ জাহেলী যুগে তোমাদের কারো স্বামী মারা গেলে এক বছরের মাথায় বিষ্টা নিক্ষেপ করতে হতো।

হুমাইদ বলেন, আমি যায়নাব (রা.) কে বললাম, এক বছরের মাথায় বিষ্টা নিক্ষেপ কি? যায়নাব (রা.) বললেন, (জাহেলী যুগে) কোনো নারীর স্বামী সারা গেলে সে একটি ছোট অন্ধকার কুঠরিতে প্রবেশ করতো এবং নিকৃষ্ট ধরনের কাপড় পরিধান করতো আর কোনো ধরনের সুগন্ধি স্পর্শ করতে পারতো না। এভাবে তার এক বছর কেটে যেতো। অত:পর তার নিকট একটি পশু-গাধা, ছাগল বা পাখি আনা হতো, আর সে তার চামড়ায় মর্দন করতো। কোনো কোনো সময় কোনো কিছু দিয়ে মর্দন করায় তা মারাও যেত। অত:পর সে বের হয়ে আসলে তাকে পশুর বিষ্টা দেওয়া হতো আর সে তা নিক্ষেপ করতো। তারপর সে (পিত্রালয়ে) ফিরে যেতো। এরপর ইচ্ছা করলে

সুগন্ধি বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারতো।[২]

একজন নারীর স্বামী মারা গেলে সে কতটা শোকাহত ও মর্মাহত হয়, তা কেবল ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করতে পারে। এ সময় তাকে সঙ্গ দিয়ে, শান্তনা দিয়ে তার মর্মবেদনা দূর করা একান্তই জরুরী। অথচ জাহেলী সমাজ তাকে একঘরে করে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতে বাধ্য করে কষ্টকে শত-সহস্র গুণ বাড়িয়ে দিত।

এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা থেকে ইসলাম নারীদেরকে মুক্তি দিয়েছে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর 'ইদ্দতকাল ৪ মাস ১০ দিন নিধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুবরণ করে, সে স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে; অতঃপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত সময় ('ইদ্দত) অতিবাহিত করে, তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিধিসম্মতভাবে যা করবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যা করছো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৩৪)

১১. বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের নির্দেশ

ইসলামের প্রথম দিকে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

"এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীগণকে রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য নির্দেশ হলো, তারা যেন তাদের স্ত্রীগণকে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে এবং তাদেরকে (বাড়ী থেকে) বের করে না দেয়। তবে তারা যদি (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তাহলে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই, আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (২, সূরা আল্ বাকারা : ২৪০)

এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উত্তরাধিকারের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। অত:পর যখন উত্তরাধিকারের বিধান নাযিল হয়, তখন এ ব্যবস্থার পরিবর্তে উত্তরাধিকারের বিধান প্রতিস্থাপিত হয়।[৩] সে বিধানে স্ত্রীর জন্য স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে অংশ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

---

২. বুখারী, কিতাবুত তালাক, তুহিদ্দুল মুতাওয়াফফা 'আনহা আরবা'আতা আশহুরিন ওয়া 'আশরা, হাদীছ নং ৫৩৩৬, ৫৩৩৭।

৩. তাফসীর ইবন কাছীর, খ. ১, পৃ. ৬৫০।

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"তোমরা যা রেখে যাও তা থেকে তারা (স্ত্রীরা) পাবে এক চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে; আর তোমাদের যদি সন্তান থাকে, তাহলে তোমরা যা রেখে যাও, তা থেকে তারা পাবে এক অষ্টমাংশ–তোমরা যদি ওসিয়াত করে যাও অথবা ঋণ রেখে যাও তা পরিশোধ করার পর।" (৪, সূরা আন্‌নিসা :১২)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] «نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ، أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীগণকে রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য নির্দেশ হলো, তারা যেন তাদের স্ত্রীগণকে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে এবং তাদেরকে (বাড়ী থেকে) বের করে না দেয়।" (২, সূরা আল্ বাকারা : ২৪০)

এ আয়াতের নির্দেশ মীরাছের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ ও এক অষ্টমাংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এক বছর 'ইদ্দত পালনের বিধানও চার মাস দশ দিন 'ইদ্দত পালনের আদেম দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।[৪]

ইসলামের এ ধরনের চমৎকার ব্যবস্থা নারীদেরকে সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বস্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছে।

১৫. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে প্রদত্ত কোনো কিছুই ফেরৎ নেওয়া যাবে না

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এতটা খারাপ হয় যে, তাদের পক্ষে আর একত্রে সংসার করা সম্ভব নয়, তাহলে এমতাবস্থায় ইসলাম তালাকের মাধ্যমে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও তালাক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল কাজ। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ "

ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হলো তালাক।[৫]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের অবনতি হলে প্রথমে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটমাট করার চেষ্টা করবে। তাতে সফল না হলে উভয় পক্ষের অভিভাবকরা মিমাংসা করার চেষ্টা করবে। তাতেও সফল না হলে তালাকের মাধ্যমে পৃথক হয়ে যেতে হবে।

---

৪. সুনান আন্‌নাসাঈ, কিতাবুত তালাক, বাবু নাসখি মাতা'ইলমুতাওয়াফ্‌আ 'আনহা বিমা ফুরিজা লাহা মিনাল মীরাছ, হাদীছ নং ৩৫৪৩।

৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, কিতাবুত তালাক, বাবু মা জাআ ফী কেরাহিয়াতিত তালাক, হাদীছ নং ১৪৮৯৪।

এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবে। স্বামী যদি তালাক দিতে রাজী না হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামী প্রদত্ত মাহরানার সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ফেরৎ দিয়ে খোলা' তালাক নেবে। স্বামী যদি তাতেও সম্মত না হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। আদালত সঙ্গত মনে করলে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেবে।

এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে প্রদত্ত কোনো কিছুই ফেরৎ নিতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا – وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের কাউকে অগাধ ধন-সম্পদও প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নেবে না। তোমরা কি তা অপবাদ রটিয়ে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? আর তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।" (৪, নিসা : ২০-২১)

সুতরাং বিয়ের সময় বা বিয়ের পর স্ত্রীকে স্বামী যা প্রদান করেছে তা ফেরৎ নিতে পারবে না। এ সকল সম্পদের স্বত্তাধিকারী স্ত্রী এবং সে সম্পদ স্ত্রীর অধিকারেই থাকবে।

১২. তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর চারটি অবস্থা হতে পারে :

১. বিয়ের সময় যার মাহর নির্ধারিত হয়েছে এবং যার সাথে স্বামী সহবাসও করেছে। এ ধরনের স্ত্রী নির্ধারিত পূর্ণ মাহরের অধিকারীনী হবে। তার কোনও অংশ গ্রহণ করার বা পরিশোধ না করার অধিকার স্বামীর থাকবে না। এ ধরনের স্ত্রীকে তিন ঋতুকাল 'ইদ্দত পালন করতে হবে।

২. মাহর নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু সহবাস হয় নাই। এ ধরনের স্ত্রী নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তাদের সাথে সহবাসের পূর্বেই তালাক দাও আর তাদের মাহর নির্ধারিত করে থাক, তাহলে তোমরা যা নির্ধারণ করেছো তারা তার অর্ধেক পাবে।" (২, সূরা আল্ বাকারা : ২৩৭)

৩. যার মাহর নির্ধারিত হয়নি, অথচ তার সাথে সহবাস করা হয়েছে। এ অবস্থায় তার পূর্ণ মাহর পরিশোধ করতে হবে।

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"আর তোমাদের জন্য (বিয়ে করা) হালাল করা হলো এতদ্ব্যতীত (হারামকৃত নারী ব্যতীত) অন্যান্য নারীদেরকে, এ শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে অন্বেষণ করবে তোমাদের সম্পদ দ্বারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য, শুধু কাম চরিতার্থ করার জন্য নয়। সুতরাং তোমরা যা দ্বারা তাদের থেকে উপকার লাভ করেছ, তার নির্ধারিত বিনিময় (মাহর) প্রদান কর। তবে নির্ধারণের পর তোমরা যদি কোনো ব্যাপারে পরস্পর সম্মত হও তাহলে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৪, সূরা আন্‌নিসা : ২৪)

এ ক্ষেত্রে যেহেতু মাহর নির্ধারণ করা হয়নি, সেহেতু তার সমকক্ষ নারীদের মাহরের আলোকে তার মাহর নির্ধারণ করতে হবে। যেমন তার চাচাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন প্রভৃতি।

৪. যার মাহর নির্ধারিত হয়নি এবং যার সাথে স্বামী সহবাসও করেনি। এ ধরনের স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর উপর মাহর প্রদানের আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করা স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের মাহর নির্ধারণ করার পূর্বে, তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এ অবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, স্বচ্ছল ব্যক্তিকে দিতে হবে তার অবস্থানুসারে এবং অস্বচ্ছর ব্যক্তিকে দিতে হবে তার অবস্থানুসারে-নিয়ম সঙ্গতভাবে, সৎ কর্মশীল লোকদের উপর এটাই কর্তব্য।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৩৬)

এ ধরনের নারীদের কোনো 'ইদ্দতও পালন করতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"হে মুমনিগণ, তোমরা যখন কোনো মুমিন নারীকে বিয়ে করো এবং তাদের সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে 'ইদ্দত পালন করতে বাধ্য করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে বিদায় দেবে।" (৩৩, সূরা আল আহযাব : ৪৯)

তালাকপ্রাপ্তা যে সকল স্ত্রীকে 'ইদ্দত পালন করতে হয়, 'ইদ্দতকালীন সময়ে তাদের ভরণপোষণ করা তালাকদাতা স্বামীর দায়িত্ব।

কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَ لِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

"আর তালাক প্রাপ্তদের জন্য বিহিতভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা মুত্তকীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৪)

অবশ্য তালাকপ্রাপ্তা যে সকল স্ত্রীকে 'ইদ্দত পালন করতে হয়না, কারো কারো মতে তাদের ভরনপোষণ করা তালাকদাতা স্বামীর দায়িত্ব নয়।[৬]

১৩. বিধবাদেরকে বিবাহে বাধাদান নিষিদ্ধ

ইসলাম প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। অনুরূপভাবে যারা বিধবা অথবা কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, তাদেরকেও পুন:বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাগাদা দিয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ধর্মে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজেও এ ধরনের প্রচলন লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন নারীর স্বামী মারা গেলে বা তালাকপ্রাপ্তা হলে তাকে পুন:বিবাহ দিতে গড়িমসি করা হয় অথবা বিবাহ দেওয়া হয়না। ফলে সে নারী এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়। অধিকন্তু এ ধরনের নারীদেরকে বিভিন্নভাবে নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হতে হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার কেউ থাকে না। ফলে সে চরম মানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। শেষ বয়সে এ ধরনের নারীদেরকে আশ্রয়হীন ও অসহায় জীবন যাপন করতে হয়। অনেকেই শেষ বয়সে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের অসহায়ত্বের জীবন কারো কাম্য নয়।

বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের যেন এমন অবস্থার শিকার হতে না হয়, সে জন্য ইসলাম তাদেরকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যে সকল নারী স্বামীহীন এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎপরায়ণ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে। তারা যদি দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন সুপ্রশস্ত, সর্বজ্ঞ।" (২৪, সূরা আন্নূর : ৩২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিয়েকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, দারিদ্রকে যেন কেউ বিয়ের জন্য বাধা মনে না করে। আল্লাহ সকলের রিযিকদাতা। বিবাহকারী দরিদ্র হলেও আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

৬. ইবন কাছীর, খ. ১, পৃ. ৬৫২।

"এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, আর তারা তাদের 'ইদ্দতের শেষ সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, যদি তারা সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্য এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা)। আর আল্লাহ অবগত আছেন কিন্তু তোমরা অবগত নও।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৩২)

যৌন চাহিদা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। বৈধভাবে এ চাহিদা মিটাতে না পারলে মানুষ অনেক সময় যৌবনের তাড়নায় অবৈধভাবে তা পূরণ করে। এতে সে যেমন গুনাহগার হয়, অনুরূপভাবে পরনারীকে যৌন হয়রানীর শিকার করে। ছেলে-মেয়েদের বিলম্বে বিয়ে দেওয়াও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়েতে বাধা দান না করে বরং দ্রুত বিয়ে দেওয়াকে বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা অন্যথায় যুবক ছেলে-মেয়েরা অবৈধ যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে নিজের চরিত্রকে কলংকিত করতে পারে। এ জন্য নবী (সা.) বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْؤًا "

'আলী ইবন আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে 'আলী তিনটি কাজে বিলম্ব করো না : সালাতের সময় হলে, জানাযা উপস্থিত হলে এবং মেয়েরা উপযুক্ত ছেলে পেয়ে গেলে।'[৭]

এ হাদীছে 'আল্‌আয়্যিম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ যে নারীর স্বামী নেই-চাই সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী, তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা বিধবা।

নারীর চারিত্রিক সুরক্ষা, মানসিক প্রশান্তি, একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের অবসানের জন্য বিবাহাধীনে থাকাই তাদের জন্য নিরাপদ ও কল্যাণকর। আর ইসলাম নারীদের জন্য সে ব্যবস্থাই করেছে। সুতরাং এ ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটানো নারীদের স্বাভাবিক জীবনাচারে বিঘ্ন ঘটানোর শামিল, যা নারীর জন্য কখনই কল্যাণকর হতে পারে না।

১৪. নারীদের সম্পদ ভক্ষণের জন্য তাদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রাখা যাবে না

জাহেলী যুগে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার বিধবা স্ত্রীরও মালিক বনে যেত। কখনো সে উক্ত নারীকে বিয়ে করত আবার কখনো তার ইচ্ছামত অন্য পুরুষের সাথে তাকে বিয়ে দিত। এ ব্যাপারে বিধবার ইচ্ছা বা পছন্দের কোনো মূল্যই দেয়া হতো না। অনেক সময় নারীদের সম্পদ ভক্ষণের জন্য তাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখা হতো। বিশেষ করে অবস্থাপন্ন বিধবা আত্মীয়াদের বিবাহ দিতে তাদের আত্মীয় বা অভিভাবকগণ সম্মত হত না। কারণ, বিধবা অবস্থায় মারা গেলে তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারীরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে। এমন কি, সম্পত্তিতে

৭. হাকিম, আল মুস্তাদ্‌রাক 'আলাষ সাহীহাইন, হাদীছ নং ২৬৮৬।

শরীক ঢোকার ভয়ে নিজের ভগ্নি ও কন্যাদের আদৌ বিবাহ দিতে চান না-এরূপ লোকও বিদ্যমান ছিল।

দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামীর মনে স্ত্রী সম্বন্ধে একটা বিরাগ ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে তার সাথে সদভাব বজায় রেখে চলা স্বামীর পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে স্বামীর এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় স্ত্রীর মনও ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠে। অনেক সময় দৈনন্দিন মান-অভিমানের নগণ্য অজুহাতকে অবলম্বন করেই পরিণামে, এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায় এবং কালক্রমে উভয়ের অন্তরের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করে যাওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এক শ্রেণীর স্বামী এ অবস্থায় ধৈর্য্য হারিয়ে স্ত্রী বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহরের টাকার কথা স্মরণ হয়, গহনাপত্রের বিষয়ও মনে আসে। মহর বাকী থাকলে তা পরিশোধ করার ও আরেক বিয়ের জন্য নতুন মহর প্রদানের দুশ্চিন্তারও উদ্রেক হতে থাকে। এ সময় স্বামী স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকে, জ্বালাযন্ত্রণা দিয়ে স্ত্রীর জন্য এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে সে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করে অথবা আরও কিছু নগদ দিয়ে স্বামীর কবল হতে মুক্তি লাভ করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা নারীদের প্রতি এ ধরনের অন্যায় আচরণ নিষিদ্ধ করে নাযিল করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"হে মুমিনগণ। তোমাদের জন্য বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া বৈধ নয়। আর প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিছু অংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করনা এবং তাদের সাথে সদাচার করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর, আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ দান করতে পারেন।" (৪, সূরা আন্নিসা : ১৯)

আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় উপরিউক্ত কাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অবস্থা বিশেষে ও শর্তাধীনে মুসলিমের পক্ষে অবৈধ নয়। কিন্তু সে জন্য এ ধরনের অসাধু উপায় অবলম্বন করা কোনো মুসলিমের পক্ষে বৈধ হতে পারে না। স্ত্রীদের নিকট হতে এভাবে তার ধন অপহরণ করা স্বামীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই নিষেধের একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে, স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলে প্রতিপন্ন হওয়ার পর। কারণ "সে অবস্থায় দাম্পত্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখে চলা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার জন্য স্ত্রী-ই দায়ী। এ অবস্থায় স্ত্রীর সম্পদের কতক অংশ ফেরৎ নেওয়া এবং স্ত্রীকে বর্জন করা স্বামীর পক্ষে অবৈধ হবে না।"■ (চলবে)

মার্কিন নীতি ও মধ্যপ্রাচ্য

মীযানুল করীম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি দল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রাবলিকান পার্টি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টি থেকে। ট্রাম্প মুসলিম, কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী বিরোধী হিসেবে পরিচিত যা বলেন, তা করেন। তাঁর মুসলিম বিরোধী নীতি হিসেবে হামাস এবং ইরানকে সর্তক করেছেন। কিন্তু ইসরায়েলকে ছাড় দিয়েছেন। ট্রাম্পের নীতি হচ্ছে মুসলিম পেষণ এবং ইহুদী তোষণ। কারণ নিজের মেয়েকে তিনি ইহুদীর কাছে বিয়ে দিয়েছেন। এতে মার্কিন ইহুদীর লবি আরো শক্তিশালী হয়েছে। ট্রাম্প একজন ইহুদী-পন্থী খৃস্টান। মুসলিম স্বার্থ হানি করে ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করা তাঁর কাজ। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ ট্রাম্প নিজে উগ্রপন্থী। কিন্তু ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হচ্ছেন। তিনি হামাসকে কড়াকড়ি করেছেন এবং ইরানকে সর্তক করে দিয়েছেন। কিন্তু ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে মানাতে পারেননি নিজের কথা। তিনি মুসলিমদের ব্যাপারে কড়াকড়ি করলেও খৃস্টানদের প্রতি উদার। তাঁর এই এক-পেশে মনোভাব বিশ্বশান্তির জন্য ক্ষতিকর।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন মাঝেমধ্যে গাজা সংকট নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করলেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন দ্বিধাহীন চিত্তেই ইসরায়েলের পাশে রয়েছেন। ট্রাম্প গাজার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উৎখাতের পরিকল্পনা নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ইসরায়েলের যুদ্ধাস্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ইসরায়েলকে গাজায় সহায়তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বারবারই আটকে দেয়। তাঁর সমর্থনের ফাঁকে গাজায় মৃতের মিছিল ক্রমাগত বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও ইসরায়েলকে সমর্থন করেছে, যেখানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সেই সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যারা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ারা জারি করেছিলেন। গাজায় ইসরায়েলের অভিযানকে অনেক রাষ্ট্র এবং সংস্থা গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার সমালোচনা করছে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোও।

ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়া বন্ধ করতে ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান আসছে। প্রশ্ন উঠছে, যদি যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন বন্ধ করে দেয়, তাহলে কী ঘটবে? এর উত্তর খুঁজতে আলজাজিরা কথা বলেছে চার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক হামজে আজগর ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওরি গোল্ডবার্গ; রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিস ইনস্টিটিউট এবং সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস এর সিনিয়র ফেলো এইচ এ হেলিয়ার এবং ইসরায়েল সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড্যানিয়েল লেভি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কী ঘটবে?

ইসরায়েলি রাষ্ট্র বিজ্ঞানী গোল্ডবার্গ বলছেন, মনে হয় অনেক পশ্চিমা রাষ্ট্র, যারা প্রথমদিকে ইসরায়েলকে সমর্থন করেছিল, তারা এখন হতাশা মনে করছে এবং ইসরায়েলের পতন দেখতে চাইছে। অনেকের জন্য, এমনকি জার্মানি, যুদ্ধ পরবর্তী যে গাঁটছাড়া তাদের ইসরায়েলের সঙ্গে ছিল, তা এখন এতটাই শিথিল হয়ে গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া তেলআবিব সম্ভবত আর টিকবে না। আমার ধারণা, বিভিন্ন দেশ সবাই অবিলম্বে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে। যদিও কেউ প্রথমে পদক্ষেপ নিতে চাইবে না। গোল্ডবার্গ বলেন, জানি না সেই পদক্ষেপ কেমন হবে তা নিষেধাজ্ঞা হতে পারে, এমনকি জাতিসংঘের সনদের অধ্যায় ৭ এর প্রয়োগ, তবে তা দ্রুতই ঘটবে।

ইসরাইল কি আক্রান্ত হবে? আমেরিকান প্রগ্রেস এর সিনিয়র ফেলো এইচ এ হেলিয়ার এর মতে, এই সমীকরণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে দেয়ার অর্থ মীমাংসার পথে সবচেয়ে বড় একক বাধাটিকে সরিয়ে ফেলা। তিনি বলেন, ইসরাইলের পক্ষে এই অঞ্চলে সত্যিকারের সংহতি স্থাপন করা কঠিন হবে। ইসরায়েল বরাবরই দাবি করে আসছে, আত্মরক্ষার জন্যই তাদের সব পদক্ষেপ। হেলিয়ার বলেন, এটি সত্যি নয়। সিরিয় সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের কারণে ইসরাইলের উপর পাল্টা আক্রমণ থেকে বিরত থাকছে না। তারা আক্রমণ থেকে বিরত থাকছে, কারণ তারা আরও যুদ্ধ চায়না, তারা জানে যে বিশাল প্রতিরোধের মুখে পড়বে; অন্য ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

আর্থিকভাবে কি ঘটবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া ইসরাইল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে না বলে মনে করেন ওরি গোল্ডবার্গ। বলেন, ইসরাইল আর্থিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর খুব নির্ভরশীল। এটি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে না। ইসরাইল হাইটেক অস্ত্র খাতে এর উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন রাতারাতি চলে গেলে পরিস্থিতি কঠিন হবে কিন্তু এটি অবিলম্বে হবে না, যতক্ষণ না আমরা বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোতে ব্যাপক ছাটাই এবং সামরিক বাহিনীর পতন দেখতে পাই।

ইসরাইলের রাজনীতিতে কি ঘটবে

আপনি যতটা ভাবছেন, ততটা হবে না। বসতি স্থাপনকারীরা নিজেদের অবস্থানে খুব দৃঢ়। তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, নেতা নিয়াহহু সম্ভবত টিকে

যাবেন। তার বলা এবং করা বেশিরভাগ কাজই ইসরাইলি সমাজের একটি অংশের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। ড্যানিয়েল ডানপন্থী দলগুলোর প্রতি আকৃষ্ট। তা ডেমোক্রেটরা ক্ষমতায় থাকলেও রিপাবলিকানরা থাকলেও। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে দায় মুক্তি দেয়। ফলে জবাবদিহি ছাড়াই তারা গাজায় গণহত্যা চালাতে পারে বা বসতি স্থাপনকারীদের উৎসাহিত করতে পারে।

সামরিক বাহিনীর কি হবে?

হামজে আত্তার এর উত্তর দিয়েছেন- যদি যুক্তরাষ্ট্র উধাও হয়ে যায়, ইসরাইল সম্ভবত প্রায় এক বছর ধরে গাজায় তার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। এর অগ্রাধিকারগুলো পরিবর্তিত হবে, তারা বেশ দুর্বল হয়ে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ইসরাইল যে বাণিজ্যিক স্যাটেলাইটগুলোর উপর নির্ভর করে, তার ভূখণ্ডকে গোপন রাখার জন্য তা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে এর শত্রুরা এর ভূখণ্ডের ভেতর দেখতে পাবে। এছাড়া তারা আয়রন ডোম এবং আরও সিস্টেমের মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হারাবে যা আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। ফলে এটি আক্রমণের জন্য আরো উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি মানে ইসরাইলকে অন্যান্য সামরিক সরবরাহকারী খুঁজতে হবে। ইউরোপের ন্যাটো দেশগুলো থেকে। তবে ইউরোপের কাছে অস্ত্রের ঘাটতি রয়েছে, এটি দ্রুত ঘটবে না। ইউরোপ যে কোন অস্ত্রের জন্য ইসরাইলের কাছ থেকে দাম নেবে যা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র নেয় না। কোন দেশ এগিয়ে এলেও ইসরায়েল বড় আকারে অস্ত্র কেনার সামর্থ রাখেনা।

গাজা ও পশ্চিম তীরে কি ঘটবে?

ওরি গোল্ডবার্গ বলছেন, মনে হয় সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যখন বুঝতে পারবে কি ঘটছে, তখন তারা অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানাবে। তিনি বলেন, মনে করি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে যে, তাদের কাছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত অস্ত্র বা টাকা নেই। ড্যানিয়েল লেডি বলেন, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে ইসরাইল নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা তারা গাঁজা এবং পশ্চিম তীরে নিজেদের সময় কেনার জন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেবে। আন্তর্জাতিক জনমতে ইসরাইলের সুনাম এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এটিকে প্রকৃত আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করেছে।

হেলিয়ার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ইসরাইলকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হবে, যেমনটি বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে হয়েছিল। বর্ণবাদী নেতৃত্বও অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের পরিবর্তন করতে হবে, কারণ তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে তাদের আর কোন বিকল্প ছিল না এবং তারা যা বাঁচাতে পারে তা রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

গাজায় যুদ্ধ বিরতির একটি প্রস্তাবের শর্ত মেনে নিতে হামাসকে শেষ সতর্কবার্তা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শর্তগুলো মেনে না নিলে পরিণতি কি হবে তাও সংগঠনটিকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হামাস বলেছে, দ্রুত বৈঠকে বসতে প্রস্তুত আছে তারা। গাজায় ২৪ মাস ধরে চলমান সংঘাতে ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরাইল। যুদ্ধ বিরতির লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। সবশেষ হামাসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, যুদ্ধ বিরতির বিনিময়ে গাজায় বন্দি সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে রাজি আছে। ইসরাইল-এর সঙ্গে হামাসের অস্ত্রসমর্পণসহ আরো বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়।

যুদ্ধবিরতির বিষয়টি থমকে ছিল। নিজের মালিকানাধীন ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লেখেন, ইসরাইলিরা আমার শর্তগুলো মেনে নিয়েছেন। এখন হামাসেরও মেনে নেওয়ার সময়। মেনে না নিলে পরিণতি কি হবে সে বিষয়ে হামাসকে আমি সতর্ক করেছি। এটি শেষ সতর্কবার্তা।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের শর্ত গুলো কি কি তা খোলামেলা করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর আগেও একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিয়েছে ইসরায়েল। গাজায় ইসরাইল হামলা বাড়িয়েছে বই কমায়নি। আলোচনার মধ্যেই গাজা নগরী দখলে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

ট্রাম্পের নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছে সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইল। খবরে বলা হয়েছে, প্রস্তাব অনুযায়ী গাজায়-বন্দী সব জিম্মিকে যুদ্ধ বিরতির প্রথম দিনেই মুক্তি দিতে হবে। বিনিময়ে ইসরাইলের কারাগারে বন্দী হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুক্তি পাবেন।

যুদ্ধবিরতির সময় গাজায় ব্যাপক পরিসরে হামলা চালানো বন্ধ রাখবে ইসরায়েল। এ সময়ে ট্রাম্পের তত্ত্বাবধানে সংঘাত পুরোপুরি থামানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করা হবে। ইসরাইলের তথ্য অনুযায়ী গাজায় পঞ্চাশ জন জিম্মি রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২০ জন জীবিত।

ট্রাম্পের এ প্রস্তাবের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি ইসরাইল। হামাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধের উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। একই সঙ্গে গাজায় বন্দি সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসতে প্রস্তুত আছে। এর বিনিময়ে গাজায় হামলা বন্ধের বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে। গাঁজা থেকে সব ইসরাইলি সেনাকে সরিয়ে নিতে হবে। স্বাধীন ফিলিস্তিনিদের নিয়ে এমন কমিটি গঠন করতে হবে, যারা সংঘাত শেষ হওয়ার পর দ্রুত গাঁজা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারবে। আগেও একাধিকবার হামাসকে হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। শিগগিরই সংঘাত শেষ হবে, এমন পূর্বাভাসও দিয়েছেন। ২৫ আগস্ট

তিনি বলেছিলেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে এই সংঘাত চূড়ান্তভাবে শেষ হবে। ক্ষমতায় বসার পর গাঁজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানায় 'মধ্যপ্রাচ্যের বিনোদন কেন্দ্র' গড়ে তোলার কথাও বলেছিলেন।

আলোচনা হবে গাঁজা পুনর্গঠন নিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রবিও ইসরাইল পৌঁছেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নেতা নেয়া ওর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তার এই সফর এমন এক সময় হচ্ছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মাত্র ৭২ ঘণ্টার ব্যবধানে ইসরায়েল কাতারসহ ছয়টি দেশে হামলা চালানোর পর উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে।

আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, রুবিওর সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দোহায় হামাস নেতাদের উপর অপ্রত্যাশিত হামলার জন্য ইসরাইলের সমালোচনা করেন। ইসরাইলে যাওয়ার আগে রুবিও সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প এই হামলায় খুশি নন। এটা আমাদের ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি পরিবর্তন করবে না। তিনি যোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল এই হামলা গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় কি ধরনের প্রভাব পড়বে, আলোচনা করবে। রুবিও বলেন, প্রেসিডেন্ট চান এটি শেষ হোক এবং শেষ হওয়ার মানে হল একসাথে ৪৮ জন বন্দি মুক্তি পাওয়া। হামাস আর হুমকি নয়, তাই আমরা পরবর্তী ধাপে যেতে পারি এটা নিশ্চিত করা। পরবর্তী ধাপ হলো- গাঁজা কিভাবে পুনর্গঠন করা হবে? তিনি আরো বলেন, কিভাবে গাজায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, কিভাবে নিশ্চিত করা হবে হামাস আর ফিরে আসবেনা? এটাই প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকার এবং এই সফরের অংশ হিসেবে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

কাতার ঘটনাগুলো এই প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রভাবিত করছে? রুবিও বলেন, কে এই কাজ করবে, কে অর্থ দেবে এবং প্রক্রিয়ার দায়িত্ব কে নেবে ঠিক করা হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র কাতার ইসরাইলের হামলা হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। এই নেতৃত্ব গাঁজা যুদ্ধ বন্দে চুক্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হয়েছিল। হামলায় শীর্ষ নেতৃত্ব বেঁচে গেলেও ছয় জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে নিরাপত্তা কর্মকর্তাও ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এটিকে একপক্ষীয় উত্তেজনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, হামলা যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইলের স্বার্থের পক্ষে যায় না। ওয়াশিংটন থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক রোজিল্যান্ড জর্ডান জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি বিনিময় করেছে। তিনি বলেন, নেতানিয়াহু সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, ইসরাইলের দৃষ্টিকোণ হল হামাস নেতৃত্বকে কাতার থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। ইসরাইলের মতে হামাস শান্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়।'

তিনি বলেন, রুবিওর ইসরাইল সফরে পরবর্তী ধাপ নিয়ে কিছু আলোচনা হবে। বিশেষ করে যেহেতু ট্রাম্প বলেছেন, তিনি গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি দেখতে চান।' হামাস বারবার

জানিয়েছে, তারা ইসরাইল থেকে নেয়া সব বন্দিকে মুক্তি দিতে এবং গাজার নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের হাতে দিতে রাজি। তবে শর্ত হল- যুদ্ধ শেষ হতে হবে এবং গাঁজা থেকেও ইসরাইলি বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে।

গাজা যুদ্ধ বন্ধে আরব নেতাদের সাথে বৈঠকে মার্কিন

গাজা যুদ্ধের অবসান এবং বিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরব ও মুসলিম নেতাদের সামনে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট জানান, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, জর্দান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের নেতারা অংশ নেবেন। জাতিসংঘে ফ্রান্স ও সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রাষ্ট্র সমাধান বিষয়ক সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোত্ত সুবিরান্তো বলেন, তার দেশ গাঁজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, শান্তির পথে এগিয়ে যেতে আমরা প্রস্তুত। গাজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে ইচ্ছুক।' ইসরাইলের চ্যানেল ১২ ও মার্কিন সংবাদ মাধ্যম অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইসরাইলি সেনাদের ভবিষ্যতে গাজা থেকে প্রত্যাহার আঞ্চলিক দেশগুলোর সেনাদের দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পুনর্গঠন অর্থায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হবে।

মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। তালেবান-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আফগানিস্তানে আটক আমেরিকান নাগরিকদের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের বিশেষ দূত এডাম বোহলার এবং আফগানিস্তানের সাবেক মার্কিন বিশেষ দূত জালমে খলিলজাদ তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাথে বৈঠক করেন।

আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, দুই পক্ষই তাদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দিয়েছে। একে অপরের দেশে আটক নাগরিকদের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করা হয়নি। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ২০ বছরের সামরিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে তালেবান ক্ষমতা গ্রহণ করে। এরপর থেকে ওয়াসিংটন এখনো তালেবান প্রসাশনকে স্বীকৃতি দেয়নি।

কাতারের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করবে যুক্তরাষ্ট্র

কাতারের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা রুবিও। ইসরাইলের তেলআবিবে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

রুবিও ইসরাইল সফরে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক শেষে তিনি কাতারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, কাতারের সাথে আমাদের নিবিড় অংশীদারিত্ব রয়েছে। আর এই যুদ্ধে (হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ) যদি কোন দেশ মধ্যস্থতা করতে পারে তাহলে একমাত্র কাতার তা পারবে।

তিনি আরো বলেন, 'এ কারণেই আমরা কাতারের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করতে যাচ্ছি। কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।' যদিও রুবিও প্রকাশ্যে বলেননি তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ইসরাইলের হামলার জেরেই যুক্তরাষ্ট্র কাতারের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপারিশে ২০১২ সাল থেকে কাতারে বসবাস করছেন হামাসের শীর্ষ নেতারা। ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে চলমান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারি তিন দেশের মধ্যে কাতার অন্যতম। বাকি দুটি দেশ হলো- যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর।

২০২৪ সালের ৩১ জুলাই ইরানে ইসরাইলের হামলায় নিহত হন হামাসের রাজনৈতিক শাখার নির্বাহী ইসমাইল হানিয়া। একই বছরের ১৬ অক্টোবর গাজায় নিহত হন তার উত্তরসূরী ইয়াহিয়া সিনওয়ার। হানিয়া ও সিনওয়া নিহত হওয়ার পর পদে আছেন খলিল আল হায়া।

খলিল আল হায়া এবং হামাসের অন্য জ্যেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করতে ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর দোহায় একটি ভবনে ইজরাইলি বিমান বাহিনী হামলা করে। মাত্র ১৫ মিনিট স্থায়ী এ হামলায় ছয় জন নিহত হন। খলিল আল হায়া ও অন্য জ্যেষ্ঠ নেতারা বেঁচে যান। এই ঘটনায় বিশ্বের প্রায় সব দেশ ইসরাইলের নিন্দা জানিয়েছে।

হামলার কয়েক ঘন্টা পর হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারিট দাবি করেছিলেন, কাতারকে সম্ভাব্য ইসরাইলি হামলার ব্যাপারে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। তিনি জানান, নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হামলার বিষয়ে আগেভাগে জানিয়েছিলেন এবং দোহায় মার্কিন সেনাঘাঁটির মাধ্যমে সতর্কতা পাঠানো হয়েছে।

ইরানের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

ইরানের তেল রপ্তানি কার্যক্রম থামিয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে হংকং ও আমিরাত ভিত্তিক কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং একাধিক কোম্পানি কালো তালিব্যক্তাভুক্ত হয়েছে।

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিদেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর (ওএফএসি) জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো ইরানের প্রধান আয়ের উৎস তেল বিক্রির অর্থ বিভিন্ন পথ ঘুরিয়ে সামরিক প্রকল্পে পৌঁছে দেয়ার সাথে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইসলামিক রেভ্যুল্যুশনারি গার্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ সরবরাহে ভূমিকা রেখেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, ইরান বহু বছর ধরে তথাকথিত 'শেডো ব্যাংকিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের অপব্যবহার করছে। এতে দেখা যায়, বিদেশে

নকল পরিচয়ে তৈরি করা কোম্পানি, আড়াল করা ব্যাংক হিসাব এবং ভার্চুয়াল মুদ্রার মাধ্যমে বিপুল অর্থ বৈধতার ছদ্মবেশ পায়। এই কৌশল ব্যবহার করে পুরানো নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে গেছে। ওএফএসি উদাহরণ দিয়ে জানায়, আলীরেজা যাদের দেরাখশন ও আরশ এস্তাকি আলিভান্দ নামের দুই ইরানি ব্যবসায়ী সরকারের জন্য প্রায় এক কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

নতুন ঘটনার ফলে এই দু'জনসহ তালিকাভুক্ত সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্রের থাকা সম্পদ জব্দ হয়ে যাবে। একই সাথে মার্কিন সামরিক বা কোম্পানি আর তাদের সাথে বাণিজ্য করতে পারবেনা।

মুসলমান অধ্যুষিত অর্ধশতাধিক দেশ রয়েছে যাদেরকে উপেক্ষা করা কঠিন। তারা ওআইসির সদস্য হিসেবে এক। তারা এক সুরে কথা বলে। মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য বলতে, পশ্চিম এশিয়া বা আরব দেশগুলোকে বোঝানো হচ্ছে।। ট্রাম্প উগ্রপন্থী হলেও মুসলমানদের জন্য কি নীতি গ্রহণ করেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এর দ্বিতীয় বার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ওর নির্বাচন নিয়ে কেউ কথা বলেননি। তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে বাইরের কিছু বলার নেই। ট্রাম্প মুসলমান, কৃষ্ণাঙ্গ এবং অভিবাসী বিরোধী কিনা এটা তাদের নিজেদের বিবেচ্য বিষয়। সে ব্যাপারে অন্যদের সাথে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্য। তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত শক্তিশালী হয়নি। কিন্তু মহাযুদ্ধ পট পরিবর্তন করে দিয়েছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক শক্তিশালী। এই কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এত গুরুত্ব।। ■

"মাসিক পৃথিবী"

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ এক ব্যক্তির ইশার নামাযে সাহু সাজদা ওয়াজিব হয়। সে ভুলে সাহু সাজদা না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং সুন্নাত, নফল ও বিতর নামায আদায় করার পর স্মরণ হয়। এমতাবস্থায় সে কি করবে?

হাবিবুর রহমান
চৌমুহনী

উত্তর ঃ যে কোন সালাতে সাজদা সাহু ওয়াজিব হলে সাজদা সাহু যদি না করা হয়, তাহলে পুনরায় ওই সালাত আদায় করতে হবে।

যে ব্যক্তির ইশার সালাতে সাহু সাজদা ওয়াজিব হয়, কিন্তু তিনি সাজদা সাহু না করেই সালাম ফিরিয়ে ইশার সালাত শেষ করেছেন, আর সুন্নাত, নফল এবং বিতর আদায় করার পর তার মনে পড়ে, ইশার ফরযে তার সাহু সাজদা ওয়াজিব হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। এখন তার করণীয় হবে, তিনি পুনরায় ইশার চার রাক'আত ফরয ও দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করবেন। বিতর পুনরায় আদায় করতে হবে না।

সুন্নাত এজন্য আদায় করতে হবে যে, ইশার দু'রাক'আত সুন্নাত ইশার ফরযের অধীন এবং ফরযের সাথে সংযুক্ত, কিন্তু বিতর তা নয়। তাই বিতর আদায় করতে হবে না।

রাদ্দুল মোহতারে বলা হয়েছে, কেউ যদি ভুলে এশার সালাত আদায় না করেই বিতর আদায় করে অতঃপর এশার সালাত আদায় করে তাহলে বিতর পুনরায় আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন-২ ঃ আমি ফজরের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে মাসজিদে এসে দেখি ফজরের সালাত চলছে। আমি জামা'আতে শামিল হয়ে গেলাম। এখন আমার জানার বিষয় হল- আমি যে ফজরের সুন্নাত পড়তে পারি নাই তা কখন পড়ব?

আরাফাত রহমান
মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ যে কোনো কারণে কেউ যদি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নত ফরযের পূর্বে আদায় করতে না পারে তাহলে সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করবে।

হাদিসে এসেছে ,

'যে ব্যক্তির ফযরের দুই রাক'আত সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়তে পারেনি, সে সূর্য উঠার পর তা পড়বে।'

(জামি' আত তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুস সালাত, অনুচ্ছেদঃ দুই রাক'আত সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা সূর্য উঠার পর পড়বে, হাদিস নং-৩৯৮)

প্রশ্ন-৩ ঃ মুসলমান কিন্তু দীনদার নয়। নামায কালাম পড়ে না, এমন দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে কি? তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি এবং সওয়াব হবে কি? লোকটি

এতই গরিব যে, অনেক সময় তাদের চুলা জ্বলে না। না খেয়ে থাকে।

আমিনুল ইসলাম

মীরপুর, ঢাকা

উত্তর ঃ যাকাত, ফিতরা, সাদাকা, দান-খায়রাত ইত্যাদি পাওয়ার প্রথম হকদার হল গরীব, মিসকিন ও অভাবী মুসলিম। এরা দীনদার হলে ভালো। না হলেও এদেরকে যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি দিলে আদায় হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"এই সাদাকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য....."। (সূরা তাওবা- ৬০)

তবে দীনদার, পরহেযগার এবং নিয়মিত নামায-কালাম পড়ে এমন গরিব মুসলিমদেরকে দেয়া উত্তম হবে।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলা জরুরি মনে করছি সেটা হল, মুসলিম ভাইদের মধ্যে যারা যাকাত, ফিতরা, দান-খয়রাত ইত্যাদি করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারা যদি একই সাথে দা'ঈ ইলাল্লাহ (তথা আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারী) হন তাহলে সেটা তাদের জন্য এবং জাতির জন্য বড়ই কল্যাণকর হবে।

একটা স্বত:সিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে- "আল ইনসানু আবীদুল ইনসান" অর্থাৎ মানুষ ইনসানের (দয়া ও অনুগ্রহের) দাস। সুতরাং আপনি যে ব্যক্তি নামাযী নয় কিংবা নামায কালামের ধার ধারে না- এমন গরিব ব্যক্তিকে যাকাত, ফিতরা ও দান-সাদাকা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করলেন তাকে যদি সুন্দর ও দরদ মাখা ভাষায় নামায আদায়ের কথা বলেন, তাহলে আশা করা যায় সে আপনার কথা ফেলবে না। এতে আশা করা যায় যে, সে নামাযী হয়ে যেতে পারে। এতে আপনার যাকাত ফিতরাও আদায় হয়ে গেল এবং একজন বেনামাযীকে নামাযি বানানোর বিরাট বড় সাওয়াব পেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, সে সারা জীবন নামায পড়ে যে সাওয়াব পাবে, সমপরিমাণ সওয়াব আপনিও পেয়ে যাবেন। সুতরাং ফিতরা, যাকাত ও দান-সাদাকারী ভাইয়েরা যদি এর সাথে সাথে দা'ঈ ইলাল্লাহ তথা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ভূমিকা পালন করেন, তাহলে আশা করা যায় যে, বহু লোক নামাযী হয়ে যাবে এবং আপনারাও বিরাট সওয়াবের ভাগী হবেন। আর এর মাধ্যমে বহু লোককে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবেন।

প্রশ্ন-৪ ঃ আমি প্রতি বছর আমার বাৎসরিক আয়ের ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে থাকি। আমার জানার বিষয় হল- ইনকাম ট্যাক্স দেয়ার পরও প্রতিবছর আমার সম্পদের যাকাত দিতে হবে কি?

নুরুজ্জামান, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া

উত্তর ঃ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে জনগণের উপর কিংবা সম্পদশালী ও বিত্তবান লোকদের উপর ইনকাম ট্যাক্স এবং আরো বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ও

কর আরোপ করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে বিত্তবান লোকদের উপর কিছু শর্তসাপেক্ষে যেমন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া এবং সে অর্থ-সম্পদ তার মালিকানায় পুরো এক বছর অতিবাহিত হওয়া ইত্যাদি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ফরয করেছেন। যাকাত হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদাত। তাছাড়া যে পাঁচটি ইবাদাত বিধানের উপর ইসলাম ভিত্তিশীল যাকাত তার মধ্যে অন্যতম। ট্যাক্স হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরোপ করা এক প্রকার কর। আর যাকাত হল বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ও নির্দেশিত একটি ফরয ইবাদাত। আর সরাসরি যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যাকাত স্বীকার করে কেউ যদি যাকাত না দেয় তাহলে সে ব্যক্তি ফাসিক ও কবিরা গুনাহগার হবে। আর ইনকাম ট্যাক্স না দিলে সরকারের একটি আইন অমান্য করা হবে মাত্র। অতএব যাকাতের সাথে ট্যাক্সের কোন তুলনাই হয় না এবং ট্যাক্স হাজার বার দিলেও যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-৫ ঃ কোন ব্যক্তি জানাযার মাঝে কিংবা শেষের দিকে জানাযায় শামিল হলে সে কিভাবে তার বাদপড়া জানাযার সালাত পূর্ণ করবে?

আবদুল লতিফ,

পটুয়াখালী

উত্তর ঃ মনে রাখবেন জানাযার সালাত চার তাকবীরের সাথে আদায় করতে হয়। জানাযার সালাতে মাসবুক মুক্তাদির করণীয় হবে, তিনি যখনই জানাযার সালাতে পৌঁছবেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইমামের সাথে জানাযার সালাতে শরিক হতে পারবেন এবং তাকবীর তাহরিমা বলে ইমামের সাথে জানাযায় শরিক হয়ে যাবেন। ইমামের চতুর্থ তাকদীর বলার পর ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে যিনি ইমামের সাথে জানাযায় শরিক হবেন, ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া পড়া ছাড়াই একে একে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন। হাদিসে এসেছে,

'যদি কোন ব্যক্তি জানাযার সালাতে এক বা একাধিক তাকবির না পায়, তাহলে সে তার কাজা আদায় করবে।' (বাইহাকি সুনানুল করবা)

যে মাসবুক ব্যক্তি জানাযার সালাতের মাঝখানে ইমামের সাথে জানাযায় শরিক হবেন, তিনি তাকবীর তাহরিমা বলেই জানাযায় শরিক হয়ে যাবেন। তার জানাযায় শরিক হওয়ার আগেই ইমাম যদি এক বা একাধিক তাকবীর বলে ফেলেন তাহলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর তিনি ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে তাকবীরের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া পড়া ছাড়াই কেবলই বাদ পড়া তাকবীর (এক বা একাধিক) আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন।

প্রশ্ন-৬ ঃ জনৈক ব্যক্তি একা একা ফরয নামায পড়তেছেন এমন অবস্থায় জামা'আত শুরু হয়ে গেলে তার করণীয় কি?

মাজেদুর রহমান, বগুড়া

উত্তর ঃ লোকটির প্রথম রাক'আতে থাকা অবস্থায় যদি জামা'আত শুরু হয়ে যায়- প্রথম মাসালা, তাহলে তিনি তার সালাত ভঙ্গ করে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন। দ্বিতীয় মাসালা, তিনি যদি প্রথম রাক'আতের সাজদা করে থাকেন, দ্বিতীয় রাক'আতের সাজদা এখনো করেননি আর তার এ সালাত যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাত না হয় অর্থাৎ দুই বা তিন রাক'আত বিশিষ্ট সালাত হয় তাহলে, তিনি সালাত ভঙ্গ করে জামা'আতে সামিল হয়ে যাবেন। তৃতীয় মাসালা, তবে যদি তিনি দ্বিতীয় রাক'আতের সাজদাও করে থাকেন তাহলে, তিনি তার সালাত পূর্ণ করবেন জামা'আতে শামিল হবেন না। আর তার সালাত যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় এবং তিনি যদি প্রথম রাক'আতের সাজদা করে থাকেন তাহলে, এমন অবস্থায় তিনি সালাত ভঙ্গ না করে দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন।

তিনি যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতের তৃতীয় রাক'আতের সাজদা করে থাকেন তাহলে তখন তিনি তার সালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে (নফল সালাত আদায়কারী হিসেবে) জামা'আতে শামিল হবেন। অবশ্য এই সালাত যদি আসরের সালাত হয় তাহলে তিনি অবশ্যই জামা'আতে শামিল হবেন না। কেননা আসরের সালাত আদায়ের পর থেকে ঐ দিন মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোন নফল সালাত আদায় করা মানা মাখরূহ।

- ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

এখানে আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

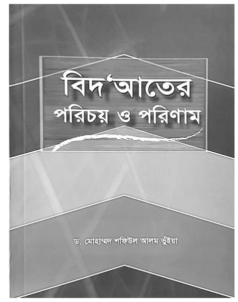

বই পরিচিতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বইয়ের নাম : **বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম**

লেখক : **ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া**

পৃষ্ঠা : **১১১**

মূল্য : ৯০ টাকা

প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

পরকালে মুক্তির জন্য প্রতিটি মুমিনের আবশ্যকীয় প্রধান শর্ত হচ্ছে দুটো। এক. শিরক মুক্ত ঈমান। দুই. বিদ'আত মুক্ত আমল বা ইবাদাত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আমরা ইবাদাতের নামে অথবা সুন্নাতের নামে অসংখ্য বিদ'আত সৃষ্টি করে নিয়েছি কিংবা প্রচলিত বিদ'আতকে যাচাই-বাছাই না করে সুন্নাত বা ইবাদাত হিসেবে পালন করে আসছি। এই বিদ'আতে সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক আলিম পর্যন্ত জড়িয়ে গেছেন। অথচ আমরা অনেকে জানিনা শিরকে লিপ্ত হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং বিদ'আতে জড়িয়ে গেলে ইবাদাত কবুল হওয়া তো দূরের কথা ইবাদাতই বাতিল হয়ে যায়।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া অনেক পরিশ্রম করে বিদ'আত সংক্রান্ত এই বইটি লিখেছেন। এটি কলেবরে ছোট হলেও প্রয়োজনীয় কোন কিছুই বাদ পড়েনি। বইটি থেকে সাধারণ পাঠকগণ যেমন উপকৃত হবেন তেমনিভাবে ওলামা সমাজও উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমরা এত পরিশ্রম করে ইবাদাত করি তা যদি বিদ'আতের সংমিশ্রণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে? এ বইটির মাধ্যমে জানা যাবে বিদ'আতের পরিচয়, বিদ'আত জানার সহজ উপায়, সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য, বিদ'আত বিদ'আতই এর কোন বিভাজন নেই, বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণতি ইত্যাদি। সমাজে অতি প্রচলিত কিছু বিদ'আতের আলোচনাও করা হয়েছে। যেমন, বিতরের সালাতের পর বসে সালাত আদায় করাকে বেশি সাওয়াবের কাজ মনে করা, বিবাহিত-অবিবাহিতদের সালাতে বৈষম্য, শবে বরাত ও শবে মেরাজের সালাত, মহিলাদেরকে জামা'আতে সালাত, জুমু'আহ ও ঈদের সালাত থেকে বঞ্চিত করা, জুমু'আর সালাতে তিনটি খুতবার প্রচলন, তারাবি সালাতে চার রাকাত পর পর সম্মিলিত দোয়া, উমরিকাযা আদায় করা, ১৩০ ফরয, বুখারী খতমের প্রচলন ইত্যাদি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনাও এ বইটিতে রয়েছে।

বইটি ছাপার আগে স্বনামখ্যাত কিছু আলিমে দ্বীন, যাদের অধিকাংশ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় রত, তাদের সমন্বয়ে একটি টিম করে বইটির বিষয়বস্তুর চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করা হয়। তারপর তাদের পরামর্শক্রমে আরও সংশোধন ও সংস্কার করে বইটি ছাপানো হয়েছে। তাই প্রতিটি বক্তব্য নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছাপার মান ভাল। পেপার ব্যাকে বাঁধাই। দামও হাতের নাগালে। যারা বিদ'আতমুক্ত ইবাদাত করতে চান তাদের জন্য বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ■